প্রকাশক :—
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চৈত্র ১৩৫২ সাল

প্রিণ্টার :—শ্রীপ্রবোধ ঘোষ
গোরাচাঁদ প্রেস
১৪ নং মদন মিত্র লেন,
কলিকাতা।

া মাত্র

মধ্য রাতের সে-কান্নাটা কেমন অচেনা, অদ্ভুত মনে হলো।

ওটা কি কোনো পাখির কান্না? কিন্তু [illegible]র পাথুরে আকাশে অমন পাখি কই?

না, মানুষের কণ্ঠস্বর। ভগ্ন, ছিন্ন, বাণবিদ্ধ।

'এত রাতে কে ওকে ফ্যান দেবে?' বললে দেবকুমার ম্লান শীর্ণ কণ্ঠে।

বিভা স্বামীর পাশ ছেড়ে উঠে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। কান্নাটা মনে হলো তাদের গলিতেই, বস্তির পিছনে।

'বার্লি আর খানিকটা আছেনা বাটিতে?'

'কেন, খাবে? জানলা ছেড়ে বিভা ফের চলে বিছানার কাছে।'

'না, আমি নয়। ঐ মেয়েটাকে ডেকে বার্লিটুকু দিয়ে দাও।'

মেয়ের কান্না! বিভা খানিকক্ষণ কান পেতে রইল। সত্যিই তো, মেয়েই তো কাঁদছে।

কিন্তু কত কষ্টে জোগাড় করেছে সে বার্লি। এমনিতে কেনবার শক্তি ছিল না, ভিক্ষে চাইবারো শক্তি ছিল না প্রথমে। কেনবার শক্তি অর্জ্জন করতে না পারলেও ভিক্ষে চাইবার শক্তি অর্জ্জন করা যায়। যখন আর ক্লেশ থাকে না, যখন হতাশা চলে যায় ক্লান্ত হয়ে!

এক চুমুক খেয়েই বার্লির বাটিটা সরিয়ে রেখেছিল দেবকুমার। জ্বরের তাড়সে নয়, বিস্বাদে। শুধু বার্লিই জোগাড় হয়েছে, [illegible]নি চিনি জোগা[illegible] হয়নি। বহুদিনের পচা জ্বরে মুখের মধ্যে একটা চাপ[illegible] [illegible]লে দিতে ভাবের জন্যে খুব ইচ্ছে হচ্ছিল তার। কিন্তু কোথাও [illegible]ড়ায় [illegible] [illegible]য় তার ঠিক এক কুঁচ। [illegible]কে বু[illegible]

তাই বলে বার্লিটা দিয়ে দিতে হবে নাকি বিলিয়ে? হাড়ে [illegible]র [illegible]া বেরিয়ে তো আবার বেরুবে বিভা। কাল চিনি, চিনি ছেড়ে চা-ও পারে। [illegible] বা নিচে

কান্নাটা চাপা, ভারি। মুক্ত নয়, আচ্ছন্ন। যেন অনেক লজ্জা ও অনেক লাঞ্ছনা দিয়ে চেপে ধরা।

'আমি যাই। দেখে আসি।'

যেন তার রুগ্ন স্বামীর চেয়েও বেশি বিপন্ন, এমনি ভাবে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল বিভা।

ঠিক তাদের বস্তির পিছনে। ছাই-কুঁড়ের পাশে।

মোছা-মোছা জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট দেখতে পেল বিভা। বেড়ার গায়ে পিঠ রেখে আধ-ভাঙা অবস্থায় বসে আছে একটা মেয়ে, দু'হাতে তলপেট চেপে ধরে। চোখ বেরিয়ে আসছে ঠিক্‌রে, গলাটা লম্বা হয়ে ঝুলে পড়েছে এক পাশে, মুখে যেন কে ঘুসি মেরেছে সোজাসুজি।

বিভা বুঝতে পেরেছে নিমেষে। তাই ফুটপাত ছেড়ে মেয়েটা চলে এসেছে নিরিবিলিতে। সঙ্গে নিয়ে এসেছে আণ্ডা-বাচ্চাগুলোকে। ফুটপাতেই কি, বা আঁস্তাকুঁড়ই কি, সবখানেই সমান খিদে। তাই সবখানেই সমান ঘুম। মার এই গোঙানিতে তাদের হুঁস নেই, যেমন তাদের গোঙানিতে হুঁস নেই সমস্ত পৃথিবীর।

বাচ্চা হ'তে মিনি বেরালটা আসত এই আঁস্তাকুঁড়েই। আসত লেড়ীকুত্তিটা। তেমনি এসেছে ভিখিরিনি। ঠিক সেই মান গাছের আড়ালে, পেঁপে গাছের তলায়।

আসছে সে আবর্জ্জনা ছাড়া আর কি।

করে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে করছে কী বিভা? কী বা র

কিছুই তার জানা নেই। সে জানেনা এ য

জানেনা! হাড্ডিসার চামদড়ি-পাকানো ঘুমন্ত শিশুগু

কয়ে সে নিশ্বাস ফেললো।

একেবারেই না জানলে চলবে কি করে? তাড়াতাড়ি

এলো রাস্তায়, ফুটপাথে। দেখলো অনেক মেয়ে ঘুমিয়ে আছে দলে-বিদলে। একজনকে টেনে তুললো। বলল, 'চল শিগগির, ছেলে হবে, তোমাদের কে ব্যথা খাচ্ছে ভয়ঙ্কর—'

বোধহয় একটা স্বজাতীয়তা আছে, মেয়েটা আপত্তি করলনা। বিভা আশ্চর্য্য হয়ে গেল, এ মেয়েটাও পেটের ভারে ঝুঁকে পড়েছে। এরও ভিক্ষান্নে হাত বাড়াচ্ছে কে আর একজন অনাগত ভিক্ষুক। তার গ্রামের পাশে আরো একটি ক্ষুধা রয়েছে উদ্যত হয়ে।

'শিগগির কিছুটা নেকড়া নিয়ে এসো, আর একটা ছুরি—'

তাড়াতাড়ি ঘরে চলে এল বিভা। ডালা-খোলা টিনের প্যাঁটরাটা বেশি হাটকাতে হলো না, কেননা সমস্তই ন্যাকড়া। কিন্তু ছুরি?

দেবকুমার মুহ্যমানের মত জিগগেস করলো; 'কি কি?'

ঝর্ণার জলের মত উজ্জ্বল কণ্ঠে বিভা বললে, 'খোকা গো খোকা—'

বাইরে এসে দেখলো, অনেক রক্ত পড়ে আছে মাটিতে। ম[illegible] জ্যোৎস্নায় কেমন কালো মনে হলো। কালো রক্ত। যেন অনে[illegible] ক্লান্তিতে ও ক্ষুধায় লাল রক্ত কালো হয়ে গেছে।

ছুরি নেই, কিন্তু বেড়া থেকে বাখারি ভেঙে নিয়ে ধারালো ধার দিয়ে নাড়ী কাটা হয়েছে। ন্যাকড়ায় জড়িয়ে শিশুটাকে শোয়ানো হয়েছে মাটির উপর।

খুদে, পঁচকে এক রতি একটা শিশু। কাঁদছে অতি নিরীহ নি[illegible] হ[illegible]। অসহায় অপরাধীর মত।

ভা[illegible] ওকে আমি ঘরে নিয়ে যাই—' অতি সন্তর্পণে ন্যাকড়ায় [illegible]

এ[illegible]র মত তলতলে সেই এক ডেলা নরম ললিত মাংসকে বু[illegible]

[illegible] বিভা। ছেলে, ছেলে, সত্যি সত্যিই ছেলে। তার হাড়ে[illegible]

তে[illegible] মাংসের মাংস।

পা[illegible]ত বিষণ্ণ চোখে তাকাল মা, তাকাল বিভার দিকে। [illegible]

তাকে বড় আশ্চর্য্য মনে হলো। বলল, নিয়ে যাও। আমার তো কত আছে—'

বুকের গরমে কি ভাবে নরম করে ধরবে ছেলেকে বুঝতে পাচ্ছে না বিভা। মা আবার বললে, 'যদি পারো বাঁচিয়ে রেখো। বড় হয়ে উঠে তবে ও ঠিক লোককেই মা বলবে।'

হয়তো সুখে থাকবে। গরিব নিশ্চয়ই, কিন্তু মাথার উপরে এখনো চাল আছে, কোমরের কাপড়টা নামানো আছে হাঁটুর নিচে। তাদের মত জনবন্যায় গা ঢেলে দিয়ে ফুটপাতের চড়ায় এসে ঠেকেনি। এখনো য়তো আশা আছে। সুদিনে বিশ্বাস আছে। ছেলেটা বেঁচেও যেতে রে বা।

তার তো কতগুলি আছে। সবগুলিই যাবে একে-একে। যদি একটা, এই শেষেরটা। তাতে তার কী? সে কোথায়? তবু, সে বেঁচে থাকবে, ভাবতে পারবে, একটা অন্ততঃ বেঁচে আছে। ীর মত বেঁচে আছে।

যাই এসেছিল সেও হয়তো শাদা জ্যোৎস্নায় দেখতে পেল কালো ালো মৃত্যু। তার অনাগতের জন্যে ঘর কোথায়?

। মধ্যে অস্পষ্ট ও করুণ একটা শব্দ শুনে দেবকুমার চোখ চাইল।

ণন সাত রাজার ধন কুড়িয়ে নিয়ে এসেছে এমনি গলায়, রছে না, না বলেও পারছে না—বিভা [illegible] উঠল, 'খোকা '

ার শক্তি থাকলে দেবকুমার উঠে বসত। নিজেরা শুতে াে থেকে আবার শঙ্করাকে ডেকে এনেছে।

ক তো মেরে ফেলবে তুমি—'

ছুতেই মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। কত মা প্রসব করেই

মারা যায়, তারপর আর কেউ এসে বুকে তুলে নিয়ে বাঁচায় সে ছেলেকে। তিল তিল করে মানুষ করে তোলে। তেমনি ওকেও সে বড় করে তুলবে। একে দিয়ে তার কত কাজ, কত আশা।

'তুমি ছিলে ইস্কুলের কেরানি, আর এ হবে দেখো স্কুলের মাস্টার, জগৎগুরু। কিছুই বলা যায় না। কোন ঝিনুকের মধ্যে মুক্তো লুকিয়ে আছে, বলতে পারো তুমি?'

তাকে আনাড়ি তো বলবেই। যখন তার নাড়ী ছিঁড়ে আনেনি এ ছেলে, যখন তার চোপসানো বুকে আনেনি এ ক্ষীরভার। কিন্তু এ অবস্থাতেও তো কত ছেলে বেঁচে ওঠে, ইটের ফাটলেও তো কত গাছ ওঠে মাথা উঁচিয়ে। সংসারে কেউই মরতে আসে না। বাতাসে যে বীজকণা উড়ে বেড়ায় সেও ইটের ফাটলে আশ্রয় খোঁজে।

'কিন্তু খাওয়াবে কী?'

সত্যিই, খাওয়াবে কী? ধুয়ে-পাখলে ছেলেটাকে শুইয়েছে এখন মান পাতায়, ন্যাকড়া জড়িয়ে টেনে নিয়ে এসেছে বিশীর্ণ কোলের মধ্যে সত্যি, খেতে চায় ছেলেটা। তার যে কান্না, সেও অনাহারের কান্না। প্রথম যে দাবি সেও ক্ষুধারই দাবি। সেও এক ধার্তেরই নালিশ।

কী খেতে দেবে? মধু? মিছরির জল দু-এক ফোঁটা? মিছরির বদলে চিনি দু-এক দানা? চিনির বদলে বার্লি?

পলতে করে দু-এক ফোঁটা বার্লিই ছেলেটার মুখে ঢেলে দিতে লাগল। বিভা বললে গর্বিতের মতো, 'কে কাকে খাওয়ায় তার ঠিক কি! তুমি কিছুই বলতে পারো না।'

সকালবেলা ছেলেটাকে দেবকুমারের পাশে শুইয়ে বিভা বেরিয়ে গেছে। বেরিয়ে গেছে মধুর খোঁজে। চিনির খোঁজে।

যারা ভিক্ষে দেয় তারা ফ্যান পর্যন্ত বোঝে, তার উপরে বা নিচে

আর কিছুই বুঝতে চায় না। আর সব কিছুই মনে হয় বাচাল বাবুগিরি। মিষ্টি তাদের ঘরেও নেই, মুখেও নেই।

নিজেদের জন্যে চেয়ে অনেকদিন সে রিক্ত হাতে ফিরেছে। কিন্তু ছেলের জন্যে শূন্য হাতে ফিরতে তার বুক ফেটে যাচ্ছে। ছোট ছেঁড়া আঁচলের ফাঁক দিয়ে নিজেই একবার তাকালে সে তার বুকের দিকে। শরীরের মরুভূমির দিকে। আশার এতটুকু একটা অক্ষরও কোথাও লেখা নাই।

আশে-পাশে তাকালো সে মায়ের সন্ধানে। ফুটপাতে, ছাইকুঁড়ের আনাচে-কানাচে। দেখা হলে জিগগেস করত, বুকে তার দুধ এসেছে কিনা। কিন্তু কোথায় চলে গিয়েছে ভিক্ষের সন্ধানে কে জানে।

ছোট একটি বারুদের বিন্দু—এই প্রাণ-কণা। ছেলেটার দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে এই খালি ভাবছে দেবকুমার যুদ্ধের প্রতিবেশে। যেন মৃত্যু ও পরাজয়ের উপরে উড়ন্ত পতাকা। সমস্ত ক্ষুধা ও কাতরতার উত্তরে পরম নির্ভয় বাণী। কিন্তু এই বারুদ-বিন্দুর সঙ্গে যে মিলবে, সেই বহ্নিকণা কোথায়?

'সমস্ত দিন এই ছেলের জন্যেই মিষ্টি খুঁজে বেড়াচ্ছি। তোমার জন্যে ওষুধ-পথ্যি বা আমার জন্যে চাল-নুন কখন জোগাড় হবে কে জানে।'

'তখনই বলেছিলাম—'

কথাটা ফিরিয়ে নিল দেবকুমার। বিভার মুখে সুন্দর হাসি। ছেলেটাকে বুকে তুলে নিয়ে বললে সে সুন্দর গলায়, 'আমার যে ছেলে হয়েছে কেউ বিশ্বাস করতে চায় না। আমি সবাইকে দেখাব, আমার কেমন সুন্দর ছেলে। আমার কত সাধনার জিনিস। খেতে আসেনি আমাদের ঘরে, আমাদের খাওয়াতে এসেছে।' বলে ছেলেটার মাথাভরা এক রাশ লতানো-লতানো কালো চুলের মধ্যে সে ঠোঁট রাখল।

কোন পাড়ে এসেছে এতক্ষণে। অনেক হেঁটেছে বিভা। যত না

হেঁটেছে তার চেয়ে বেশি বসে-বসে প্রতীক্ষা করেছে দো হাড়ের শিশু
আজ সে অনেক সাহসী, অনেক সুরক্ষিত। তার বুকের কা
তার ছেলে রয়েছে ঘুমিয়ে। ং যেন তৃপ্তি

কেউ আর তার দিকে আঠালো চোখে বেশিক্ষণ তাকাতে পারে না! ছেলের গায়ে লেগে সে-দৃষ্টি ধাক্কা খেয়ে গুটিয়ে যায়। করুণার বাজারে বেড়ে গেছে তার দাম, লালসার বাজারে বেড়ে গেছে তার মর্য্যাদা।

শুধু তার এক ভয়। একজনের থেকে।

আঁচলে আজ তার অনেক পয়সা—সে ভয় নয়। বুকের কাপড়ের নিচে যে তার ছেলে সে-ভয়। যদি সে মা এসে এখন, আঁচল থেকে পয়সা নয়, বুকের থেকে তার ছেলে নিয়ে যায় ছিনিয়ে! তার এই সৌভাগ্যে, এই ঐশ্বর্যে যদি তার গায়ের রক্তে আগুন ধরে যায়!

বিকেল হতেই কোন বাড়িতে ভিড় বসে গেছে ভিখিরিদের। বাপের শ্রাদ্ধে কোন বড় লোকের ঘরে-পড়া বিলাসিনী মেয়ে ভিখিরি বিদেয় করছে। সন্ধে হয়ে গেলেও ফুরোচ্ছে না ভিখিরির দল।

বিভাও গেছে সেখানে। তার যা নেবার আজই নিতে হবে কুড়িয়ে-বাঁচিয়ে। অনেক পেয়েছে সে আজ ছেলের দৌলতে, প্রায় আশাতীতরূপে। আরো চাই। যত পাই তত চাই। তার বুকের মধ্যে দাগা রয়েছে আ প্রয়োজনের প্রমাণ। হোব

শুনল, টিকিট লাগবে। ফটকের বাইরে তাই দাঁড়িয়ে রইল এক দিক পাশে। দেখছে, প্রত্যেক ভিখিরি পাচ্ছে রুটি আর গুড় আর দু'আনা কিন করে পয়সা। ঝোলা গুড় পেলেই বা মন্দ কি! আঙুলে করে দিয়ে দিতে পারে মুখের মধ্যে।

কিন্তু তার উপরে চোখ পড়ল সে বিলাসিনীর। উপরের বারান্দা থেকে। না পড়েই যে পারে না। তার বুকের কাছে সদ্যোজাত শিশুর

আর কিছুই বুঝতে চ-বুক ঢাকা রইলেও বেরিয়ে আছে তার পা দুটি, বাতাবি-বিষ্টি তাদের ঘরেও ক্তে ছোট-ছোট আঙুল।

নিজেদের জন্যে টিকিট, ডেকে আনো ভিতরে। ক'দিন আগে জন্মেছে শিশু, আহা, ওরি মধ্যে বেরিয়ে পড়তে হয়েছে। ভদ্রলোকের ভগ্নাবশেষ হয়তো। দেখছ না, ঘোমটাটা এখনো একেবারে সরিয়ে ফেলতে পারছে না। কণ্ঠস্বরে আনতে পারছে না কাকুতির নির্লজ্জতা। শুধু সদ্যোজাত শিশুর সার্টিফিকেটটা বুকে করে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। ক্লান্ত কালিমার মধ্য দিয়ে। ছেঁড়া কাপড়ে অপহৃত সুষমার অস্পষ্ট ইসারা রেখে।

সবাইকে যদি দু' আনা, ওকে দু' টাকা। বোতলে করে ছেলের জন্যে দুধ, কাগজের ঠোঙায় কিছু চিনি-মিছরি। আর এই নাও কিছু শাড়ি জামা, তোমার জন্যে, তোমার ছেলের জন্যে।

ওর সঙ্গে কার সঙ্গে কথা! ও একেবারে তলায়-পড়া কাদা মাটি নয়, ও শ্যাওলা, মূলহীন শূন্যচারী মধ্যবিত্ত ভদ্রতার দুঃস্থ প্রতিনিধি। যে মধ্যবিত্ততা একদিন দাঁড়াবে এসে যে চেহারায় ও যেন তারই পূর্বাভাস। ওকে বাঁচাতে হবে। ওকে মিশে যেতে হবে। ওর ছেলেকে বাঁচাতে পারব। বাঁচাতে হবে ওর সংস্কার-স্বভাব। ওকে বিচ্ছিন্ন রাখতে হবে। 'তখন মিশে যেতে দেওয়া হবে না। ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে ঘরে, কথাটা ওর সীমাবোধের মধ্যে!

ছেলেটাকে তাই ওকে বেশি করে দাও।

হয়েছে কোর্টকের থেকে যখন বাইরে বেরিয়ে এসেছে বিভা, তখন অন্ধকার।

কেন এখানে ওখানে তখনো ভিক্ষুকের জটলা। অন্যায় পক্ষপাতের জন্যে অনেক নালিশ চলেছে পরস্পরের মধ্যে। দানের বেলায় যে বণ্টন সেখানে পর্যন্ত পক্ষপাত!

কত দূর এগিয়ে আসতেই কে পিছু নিয়েছে বিভার। অন্ধকারে

চমকে চেয়ে দেখল বিভা, সেই মা। সঙ্গে সেই কটা চলন্ত হাড়ের শিং অনেক ক্লান্ত, অনেক বঞ্চিত—প্রতারিত।

কিন্তু, আশ্চর্য, মার মুখে কোনো অভিযোগ নেই। বরং যেন তৃপ্তি স্নেহ।

'কেমন আছে ও?' ঝুঁকে পড়ে জিগগেস করল মা।

ভয় পেয়ে দ্রুত দৃঢ় হাতে ছেলেটাকে বুকের মধ্যে আরো গুটিয়ে নিল বিভা। এ কি, কেড়ে নেবে নাকি? ইস, নিলেই হল? কে বলবে এ তার নিজের ছেলে নয়? কোথায় লেখা আছে এ ওর ছেলে?

না, অত ভয় পাবার কিছু নেই। মার মুখে অগাধ শান্তি।

ম্লান হেসে বিভা বললে, 'কেন, ছেলে ফিরিয়ে নেবে নাকি।'

'না, ও কথা মনেও আনতে পারি না। তোমার কাছে ও বেঁচে থাকবে, কত সুখে থাকবে। আমাদের কোলে ছেলের আবার একটা দাম কী! তোমাদের কোলে ওর দাম লাখ টাকারো বেশি। এই তো দেখলাম আজ চোখের উপর, আমরা পেলাম কি, আর তুমি পেলে কি। এমনি খালি হাতে গেলে হয়তো টিটকিরি পেতে, কিন্তু বাছাকে বুকে করে নিয়ে গেছ বলে—'

বিভা তাড়াতাড়ি হাঁটতে সুরু করল। বাঁ হাতে তার ছেলে চেপে ধরা, ডান হাতে কাপড়ের বোঁচকা।

'শোনো, দাঁড়াও না একবারটি এই থামবাতির নিচে। হোক ঠুলি-পরা, তবু দেখতে পারব বাছার মুখ। ও পেটে আসবার ক'দিন পরেই ওর বাপ মারা গেল, একবার দেখব সেই মুখের ছাঁদ এসেছে কিনা ফিরে। দেখাও না, সরাও না একবার তোমার বুকের কাপড়টা। শুধু একবার—'

অসম্ভব। আরো তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগল বিভা। ছেলেটাকে বোঁচকার মধ্যে পুরে নিতে পারলে আরো জোরে হাঁটা যেত, এক হাতের

..র যেত কমে। কিন্তু তখন এই রাস্তার মধ্যে ছেলেটাকে বোঁচকার মধ্যে চালান দেয়া সম্ভব নয়।

না, আর পিছু নেয়নি। ছেড়ে দিয়েছে তো ছেড়েই দিয়েছে। শরীরের শ্রমটুকু ভিক্ষে করে ধুয়ে বেড়াবার জন্যে জমিয়ে রাখলে বরং কাজ দেবে।

এটা একেবারে একটা নির্জন গলি। একটা ভিক্ষুক পর্যন্ত নেই। যদিও কাছেই একটা ডাস্টবিন রয়েছে কানায়-কানায় ভর্তি।

বোঁচকাটা নামিয়ে রেখে ছেলেটাকে বার করে নিল সে বুকের তলা থেকে।

কৃষ্ণপক্ষের মরা চাঁদ উঠে আসতে তখনো অনেক বাকি। তবু সেই মরা মুখটা চোখের দৃষ্টিতে অনুভব করে নিতে তার এক নিশ্বাসও দেরি হল না। তার গায়ে যে কালো-কালো পিঁপড়ে বেয়ে উঠেছে তার চলন্ত সার পর্যন্ত তার চোখে পড়ল।

উপরের থেকে ছাই-পাশ কুটোকাটা কিছুটা সরিয়ে নিয়ে ডাস্টবিনের মধ্যে ছেলেটাকে বিভা গোর দিলে। তারপর বোঁচকাটা কুড়িয়ে নিয়ে হাওয়ার মত হালকা হয়ে বেরিয়ে গেল।

যদি দেবকুমার জিগগেস করে, ছেলে কোথায়, তখন সে না হয় বলবে, ভীষণ ঝঞ্ঝাট, তার মার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছি।

কী করে সে বলবে, তাকে তো বাঁচাতেই পারিনি, বাঁচাতে পারিনি তার জন্মের সুনামটুকুও! তার লাল রক্ত কালো করে দিয়েছি!

বাঁশবাজি

খোড়্পাছির মাঠে গাজনের মেলা বসেছে।

এবার লোকজন বিশেষ জমেনি, মাল-পত্রও বিশেষ কিছু নেই। তেলে ভাজা দুর্গন্ধ পাঁপর, বিন্নে ধানের খই আর শিল-পড়া কতক কাঁচা আম। কাগজের এবার বড় অভাব, ঘুড়ি-ফুরফুরি নেই একখানাও। মাটির পুতুল—কুকুর-বেরাল, হাতি-ঘোড়া—সকলের এক রঙ, শুধু চোখ বা নাকের ডগা বা লেজের শেষ বোঝাবার জন্যে কালোর দু'একটা ফোঁটা বা আঁচড় কাটা হয়েছে। আছে কিছু চাঁচের ও বাঁশের জিনিস, ঝুড়ি চ্যাঙারি, খায়া-খালুই। আর আছে হাঁড়িকুঁড়ি সরা-মালসা, কলকে ধুনুচি। নেই সেই গামছা, নেই বা কাঁচের চুড়ি।

যারা তবু এসেছে সব যেন কেমন কাহিল চেহারা, চলকো, ঝিম-মারা। যেন কি একটা আতঙ্কের অন্ধকূপ থেকে বেরিয়ে এসেছে মরতে-মরতে। চলায়-বলায় ফুর্তি নেই এক রতি! পরনের কাপড় কানি হয়ে আসছে দিনে দিনে।

পাকড়া গছের তলায়ই বেশি ভিড়। আর বেশি গোলমাল। কাছেই কোথায় একটা ট্যামটেমি বাজছে।

এগিয়ে গেলাম। শুনতে পেলাম একটা ছোট ছেলের কান্না।

'আমি পড়ে যাব, আমি মরে যাব।' আকুল আফুট চোখে কাঁদছে সেই ছেলেটা। ছ-সাত বছর বয়স, পেঁকাটির মত হাত-পা, কোমরের নিচে ছেঁড়া টেনি আঁটা। বাসা থেকে খসে-পড়া না-ওড়া পাখির বাচ্চার মত অসহায়।

ব্যাপার কি? কাঁদছে কেন?

সবাই বললে, বাঁশবাজি হবে।

প্রথমটা বুঝতে পারিনি। ভেবেছিলাম বাঁশ দিয়ে পিটবে বুঝি ছেলেটাকে, তাই কাঁদছে অমন অঝোরে। কিন্তু সবাই বললে, মার নয়, খেলা।

... করে আদাল... বল নেয় শুনেছি, তখনও বাজে। বাঁশ নিয়ে আর যে কোন খেলা হয় দেখিনি তখনো।

"মাটিতে পুঁতে নেবে তো বাঁশটা ?" কে একজন জিগগেস কর...

না, এ সে মামুলি খেলা নয়। ওয়াকিবহাল কে একজ... ভারিক্কি গলায়, না, বাঁশটা বুড়ো পেটের ওপর বসাবে, আর বেয়ে বেয়ে উপরে উঠে যাবে ছেলেটা, একেবারে ডগার ওপর। সেখানে ও বাঁশের মুখ পেটের ওপর চেপে ধরে মুখ নিচু করে ঝুঁকে পড়বে। আর, বুড়োর পেটের ওপর বাঁশ ঘুরবে বন বন করে আর ছেলেটা হাত ছেড়ে দিয়ে চরকির মত ঘুরপাক খাবে। আমি আগে আরো দেখেছি ওর খেলা!'

'ঐ বুড়ো বুঝি?'

'হাঁ, ওই মস্তাজ।'

শনের দড়ির মত পাকিয়ে গেছে বুড়োর শরীর, থুতনির উপর হলদেটে ক'গাছ দাড়ি রয়েছে উচিয়ে। বুকটা টিপ...ল মতন, পেটটা দ পড়া, হাতে পায়ের মাংসগুলো হাড়ের থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে। বিকেলের রোদে কোঁচকান চোখ দুটো তার চকচক করছে—সেইটুকুই তার যা-কিছু সাহস আর অভিজ্ঞতার চিহ্ন।

গোল হয়ে দাঁড়িয়েছে সবাই। টিনের একটা ফুটো মগ নিয়ে মস্তাজ সবাইর কাছ থেকে পয়সা কুড়োচ্ছে।

"খেলা সুরু হল না, আগেই পয়সা?" কে একজন ধমকে উঠলো।

'খেলা হয় কি করে? বাঁশে যে চড়বে সেই তো কেঁদে রসাতল করছে। 'পড়ে যাব, মরে যাব'—এ কেমনতর কান্না? পড়েই যদি যাবি তবে কে আসতে বলেছিল তোদের খেলা দেখাতে?

ছেলের কান্নাতে মস্তাজের ভ্রূক্ষেপ নেই। 'হবে, হবে, সুরু হচ্ছে এখুনি।' সবাইকে আশ্বাস দিয়ে সে শূন্য মগ দেখিয়ে দেখিয়ে ঘুরে যায়।

'খেলা তো আর ওরা নতুন দেখাচ্ছে না, তবে কাঁদছে কেন ঐ ছেলেটা ?' জিগ্‌গেস করলাম পাশের লোককে।

'এতদিন ও ছিলনা। ও নতুন।'

'তবে কে ছিল এতদিন ?'

'ওর দাদা—'

'না, না, ঐ ছেলেটাও দেখিয়েছে দু'-একবার।' কে আর একজন উঠল প্রতিবাদ করে। 'সরস্বতী পূজার সময় তেঁতুলের ইস্কুলের মাঠে এই ছেলেটাই উঠেছিল বাঁশ বেয়ে। এখনো তত রপ্ত হয়নি—বেয়ে বেয়ে চুড়োয় উঠে আসাটাই সেদিনকে ওর খেলা ছিল। আসল খেলা দেখিয়েছিল অবিশ্যি ওর দাদাই। আর যাই বলুন আসল কসরৎ যে বাঁশ বেয়ে উঠে আসে তার নয়, যে বাঁশটা পেটের ওপর চেপে ধ'রে রাখে তার—মস্তাজের।

'কই ওর দাদা ?'

'কে জানে !'

টুং করে একটিও আওয়াজ হল না মস্তাজের মগে। খেলা না দেখে কেউ পয়সা দিতে রাজি নয়।

অনন্যোপায় হয়ে মস্তাজ ছোট ছেলেটার কাছে এগিয়ে গেল। পিছনে দেয়াল, সামনে বুনো কুকুর তাড়া করেছে এমনি ভয়ে চেঁচিয়ে উঠেছে ছেলেটা। 'না, না, আমি না। আমি পড়ে যাব, আমি মরে যাব—' !

বাপ একবার তার হাত ধরে টান মারলো হেঁচকা। মারবার জন্যে হাত ওঁচালো একবার।

'হুঁ', ভয় দেখ না ছেলের। তোর বাপ কত খেলা দেখিয়ে এল কত জোয়ান জোয়ান ছেলে নিয়ে, আর তোকে কিনা সামলাতে পারবে না, পুঁচকে একরত্তি ছেলে।' বাপের হয়ে ছেলেকে কেউ-কেউ তিরস্কার করলে।

মস্তাজ একটু হাসল। অনেক অভিজ্ঞতায় মসৃণ, ধারালো সেই হাসি।

'পড়েই যদি যাস, বাপ তোকে দু হাত বাড়িয়ে লুফে নিতে পারবে না? নে, উঠে আয়।'

যে লোকটা ট্যামটেমি বাজাচ্ছিল সে আরো জোরে কাঠির বাড়ি মারতে লাগল।

কিন্তু ছেলে কিছুতেই রাজি হয় না। সকল কোলাহল ছাপিয়ে তার কান্নাই প্রবল হয়ে ওঠে।

খেলা আর জমল না তা হলে। দু'একজন করে খসে পড়তে লাগল।

মস্তাজ অসহিষ্ণুর মত গলা উঁচিয়ে তাকালো একবার ভিড়ের বাইরে। কতক্ষণ পরে কে-আরেকটা ছেলে দুর্বল পায়ে হাঁটতে হাঁটতে কাছে এসে দাঁড়ালো। হাতে একটা আধ-খাওয়া পাঁপর।

'ওই ওর দাদা।' জানা লোকেরা হৈ-হৈ করে উঠল।

বছর দশকের রোগা-পটকা ছেলে। লিকলিকে হাত-পা। গায়ে একটা ছেঁড়া পাতলা কাঁথা জড়ানো। ঠোঁটের চার পাশে, গালে ও থুতনির নিচে কাটা ঘা, একটা ঢণ্ঢনে মাছি বারে বারে উড়ে এসে বসেছে তার নাকের ডগায়। দুটো ভাসা ভাসা চোখে কেমন একটা শূন্য অর্থহীন চাহনি।

ছোট ভাই'র কাছে এগিয়ে গেল। বললে, 'তোকে কাঁদতে হবে না আকু, আমিই খেলা দেখাব।'

আকু চুপ করল। চোখের জল শুকিয়ে গেল দেখতে দেখতে।

আরো ঘন হয়ে এল জনতা। ট্যামটেমির বাজনা আরো টাটিয়ে উঠল।

কোমর ও হাঁটুর মাঝে যেটুকু কাপড় ছিল ভুর করে তাই আরো

খাটো ও আঁট করে নিল মস্তাজ। বাঁশটাকে বসাল পেটের উপর, নাই-কুণ্ডলের গর্তে। কি যেন বলল বিড়বিড় করে। বোধ হয় বিসমিল্লার নাম করলে। বাঁশটা একবার কপালে ঠেকাল। গায়ে হাত বুলিয়ে মুখের খুব কাছে টেনে এনে কি বললে তাকে।

এমন করতে কেউ তাকে দেখেনি কোনো দিন। এতটা চলবিচল হয়ে যাওয়া।

'চলে আয়, ইন্তাজ।' ডাক দিল সে বড় ছেলেকে।

ইন্তাজ মুহূর্তে গায়ের কাঁথাটা খুলে ফেলল।

কে যেন হঠাৎ পেটের মধ্যে টেটা ঢুকিয়ে দিল—এমনি আঁৎকে উঠলাম। ছেলেটার বুকে-পেটে টানা-টানা ঘা, কোথাও দগ দগ করছে, কোথাও খোসা পড়েছে, কোথাও বা পুঁজ উঠেছে দলা পাকিয়ে। সেই চন্দনে মাছিটা হঠাৎ আর কটা গুয়ে মাছি ডেকে এনেছে। যখন ঘুরে দাঁড়াল ইন্তাজ, তখন খানিক স্বস্তি পেলাম। কেন না পিঠটা ওর মসৃণ, নিদাগ।

'কেমন করে হল এই ঘা? এতগুলি ঘা?' জিগ্‌গেস করলাম জনতাকে।

কেউ কেউ জানে দেখলাম। দোল পূর্ণিমার দিন চাঁপালির বাবুদের বাড়ীতে খেলা দেখাবার সময় বাঁশের মাথা থেকে পড়ে যায় ইন্তাজ। বুড়ো তার কতদিন আগে ম্যালেরিয়া থেকে উঠেছে, আমানি পান্তাও নাকি জোটাতে পারেনি তারপর, তাই বাঁশটাকে বাগ মানিয়ে রাখতে পারেনি পেটের মধ্যে। যেখানে পড়ল ইন্তাজ সেখানে ছিল খোয়া আর খোলামকুচি, বুক পেট ছড়ে কেটে একাকার হয়ে গেল। সেই থেকেই ছেলেটা একটু কাবু হয়ে পড়েছে।

'ন্যাতাটা গায়ে জড়িয়ে নিবি না?' জিগ্‌গেস করল মস্তাজ।

'না।' দু' হাতে ধুলো মেখে ইন্তাজ লাফিয়ে উঠল বাপের পেটে

বাঁশ ধরে। দীর্ঘ অভ্যাসে মসৃণ, তরতর করে বেয়ে উঠতে লাগল। দু' হাত দিয়ে পেটের উপর বাঁশটা শক্ত করে চেপে ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল মস্তাজ।

'দেখুক, দেখুক এবার আক্কাছ। এত ঘায়ের যন্ত্রণা নিয়েও তার দাদা কেমন রাজি হল খেলতে।'

আক্কাছ বা আকু ঘাড় উঁচু করে চেয়ে আছে দাদার দিকে। এখন আর তার ভয় নেই। সে এখন ট্যামটেমি বাজাতে পারে। কিংবা মগ নিয়ে ঘুরতে পারে পর-পর।

বাঁশের চূড়ার কাছে এসে ইস্তাজ একবার স্থির হয়ে দাঁড়াল, পেটের কাছে কাপড় জড় করে বাঁশের মুখটা ঠিক করে বসাবার জন্যে। তখন তার ঘাগুলি আরেকবার স্পষ্ট করে দেখলাম। অসহ্য লাগল। ভাবলাম, চলে যাই।

কে একজন বাধা দিল। বলল, তার পর যখন ব্যাঙের মত হাত-পা ছড়িয়ে ঘুরতে থাকবে শূন্যে তখন ওসব ঘা-টা কিছু দেখা যাবে না।

'বাঁশটা কি বাপ হাতে করে ঘোরবে নাকি?'

'কতক্ষণ হাতে করে ঘুরিয়ে বাঁশটা পেটের উপর রাখবে, তারপর মোচড় খেয়ে-খেয়ে আপনিই বাঁশটা ঘুরবে পেটের গর্তের মধ্যে। সেই তো আসল খেলা।'

'নইলে বাঁশ পুঁতে তার ওপর ডিগবাজি খাওয়াটা তো সেকেলে। তাতে আর বাহাদুরি কি!' আরেকজন ফোড়ন দিল।

ততক্ষণে বাঁশ ঘুরতে সুরু করেছে মস্তাজের দু'হাতে। চোট খাবার পর ছেলেটা নিশ্চয়ই খুব হালকা হয়ে গেছে, ঘুরছে ফুরফুরির মত। হাত পা ছড়িয়ে। ঘা তো বোঝাই যাচ্ছে না, বোঝা যাচ্ছে না ওটা কোনো মানুষ না বাদুড় না চামচিকে!

এতক্ষণ আকাশের দিকে মুখ করে ছিলাম, এবার তাকালাম

মস্তাজের দিকে যখন সে হঠাৎ ঘুরন্ত বাঁশের প্রান্তটা পেটের খাঁজের মধ্যে গুঁজে দিলে। তারপর হাত দিল ছেড়ে। ছেলের পেটের চেয়ে বাপের পেটটাই বেশি দেখবার মত। ছেলের পেটে ঘা, বাপের পেটে প্রকাণ্ড খোদল। বাঁশটা গ্রহণ করবার জন্যে মস্তাজের পেটে এ সাময়িক গর্ত তৈরি হয়নি, যেন অনেক দিন থেকেই এ গভীর গহ্বরটা সেখানে বাসা বেঁধে আছে। সেই গর্তটা ঘুঁটে ঘুঁটে ঘুরছে না জানি কোন জলন্ত মন্থনদণ্ড।

বাঁশের শেষ প্রান্তটা কত দূর পর্যন্ত চেপে ঠেলে দিয়েছে পেটটাকে নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস হচ্ছিল না। পেটে-পিঠে এক, এমনিতে দেখেছি অনেক। এখন দেখলাম পেট বলে কিছুই নেই আর মাঝখানে, বাঁশের মুখটা সটান পিঠের উপর বসানো, সামনের দিক থেকে। পেটের সব নাড়িভুড়ি শুকিয়ে কুঁকড়ে কোথায় সরে গেছে, মেরুদণ্ডের হাড়ের সঙ্গে ঠোক্কর খেতে-খেতে খটাখট শব্দে চলছে বাঁশের ঘুরুনি।

প্রতি মুহূর্তে যা ভয় করছিলাম। ইন্তাজ ফসকাল না, মস্তাজই টলে পড়ল। শেষ মুহূর্তে দু'হাত বাড়িয়ে ছেলেটাকে লুফে নেবার চেষ্টা করেছিল মস্তাজ, কিন্তু যতই ফুরফুরে পাতলা হোক, বাপের দুর্বল বাহু আশ্রয় দিতে পারল না ইন্তাজকে।

'—আজকাল বারেবারেই বুড়োর কেবল ফসকে যাচ্ছে—'কে একজন আপত্তি করে উঠল।

মস্তাজ দু'হাতে মাথাটা চেপে ধরে বসে আছে উবু হয়ে। দৌড়-খাওয়া পাকতেড়ে ঘোড়ার মত ধুঁকছে, আর ড্যাবডেবে চোখে তাকিয়ে আছে শূন্য মগের দিকে।

তারি জন্যে হয়তো খেলা সুরু হবার আগেই মগটা সে তুলে ধরেছিল সবাইর কাছে। কয়েকটা পয়সা আগে পেলে সে কিছুটা খেয়ে নিতে পারত, এক-আধখানা পাঁপর কি চামদড়ির মত শুকনো দু-একটা ফুলুরি! পেটে কিছু পড়লে পেট হয়তো এক চোটেই পিঠ হয়ে পড়ত না, থুবড়ে

বাহু দুটোতেও একটু জোর আসত। অভ্যাসে সব কিছুই সওয়ানো যায়, শুধু বুঝি ক্ষুধাকেই বাগ মানানো যায় না। বাঁশ, বাহু, ছেলে, ঘা—সব কিছুরই মুখোমুখি দাঁড়ানো যায় একমাত্র অভ্যাসের সাহসে—শুধু ক্ষুধাটাই দুর্বিনীত, ক্ষমাহীন।

বাঁশটা ছিটকে পড়েছে দূরে। ইন্তাজ আরো দূরে। উত্থিত গোলমালের মাঝে তার গোঙানিটা শুনতে পেলুম না। কেউ বললে, হয়ে গেছে। কেউ বললে, বুকের কাছটাতে ধুকধুক করছে এখনো।

কাছেই দাতব্য চিকিৎসালয়। যতদূর সম্ভব ঘায়ের ছোঁয়া বাঁচিয়ে ইন্তাজকে ধরাধরি করে কারা নিয়ে গেল ডাক্তারখানায়। ঘটনাটা সদ্য-সদ্য ঘটেছে বলে দাতব্য চিকিৎসালয় একেবারে ফিরিয়ে দিতে পারবে না হয়তো। নইলে এমনিতে ঘায়ের ওষুধ নিতে এলে ফিরিয়ে দিত নিশ্চয়ই। কেননা প্রতিবারের ওষুধ নেয়ার সময় এক আনা করে পয়সা দিতে পারত না মন্তাজ। যদি এক-আধ আনা পয়সা তার হাতে আসে, সে কি তা দিয়ে পেটের উপরের ঘা শুকোবে, না, পেটের ভিতরের ঘা?

মন্তাজ বসে আছে চুপ করে, গোঁজ হয়ে, কিন্তু ছোট ছেলে আক্কাছ কাঁদছে একেবারে গলা ফাটিয়ে। ভাবলাম দাদার জন্যেই বুঝি তার কান্না।

কিন্তু মুখে তার সেই এক আর্তনাদ, এবার আরো নিঃসহায় কণ্ঠে। এবার আমার পালা। এবার আমার পালা। আমি নির্ঘাত পড়ে যাব, মরে যাব আমি।—

মন্তাজ কিছুই বলল না। আকুর হাত ধরে চলল হাসপাতালের দিকে।

'পড়ে যাব, মরে যাব।' কোন অদৃশ্য আল্লার কাছে শিশুকণ্ঠের করুন অথচ কোন প্রতিকারহীন কাকুতি?

মন্তাজ কিছুই বলছে না। পাথুরে মুখে নিষ্ঠুর নির্লিপ্ততা। ছেলের কান্নার উত্তরে রেখাহীন কাঠিন্য। উপায় কি, তাকে খেতে হবে তো।

বৃত্তশেষ

পেয়াদা-বাবু এসেছেন। ঘাটে-বাটে লোক জমে যাচ্ছে পটকে, অথচ বা গা-ঢাকা দিচ্ছে ভয়ে ভয়ে! ... অথচ

ইস্তাহার আছে, দখল আছে, অস্থাবরও আছে এক নম্বর। ...প।

অস্থাবরটা ক্ষেত্র তুয়ারীর নামে। দোয়া গাই, বকনা বাছুর, এঁড়ে দামড়া—কিছুই বাদ দেবে না। পোয়াল-কুড় পর্যন্ত।

যতই পেয়াদা-বাবু হোক, ক্ষেত্র চেনে মনোরথকে। এককালে সরিক ছিল তারা। উলুমাঠ ভেঙে চাষ করেছিল দুজনে। চাষকারকিও ছেড়ে দিয়ে মনোরথ চলে গেল সদরে, ঘুষ-ঘাষ দিয়ে আদালতের রাত পাহারার কাজ নিলে। এদিকে জঙ্গল উঠিত্ হল, তবু মনোরথ ফিরে এল না। রাত-পাহারা থেকে হল সে আদালতের সেপাই, চাপরাশটা কখনো কাঁধে, কখনো কোমরে। ক্ষেত্র সেই যে-কে-সে চাষা, সেই ধান ছিটেন করে, বীজপাতার চাতর দেয়। থাকে খোড়ো ঘরে। মাটিতে গা পেতে।

'আমি ক্ষেত্তর।'

মনোরথ চিনতেই পারে না। তার এখন অনেক সম্মান। পায়ে জুতো সঙ্গে দোত-কলম। ভাবটা ছোটলাটের মত।

'অণ্ডিম্যাণ্ড হ্যাণ্ডনোটের মামলা। ডিক্রি জারিতে পাওনা সাতান্ন টাকা সাড়ে তেরো আনা।' মনোরথ নিশানদারকে সনাক্ত করতে বলো।

'ওরে মনো, চেয়ে দেখ। আমি ক্ষেত্তর—'

'গরজারি করিয়ে দিতে হলে দু টাকা লাগবে।' মনোরথ বলে কানে-কানে।

'আমার গলায় ছুরি দিবি? মরলে হাঁড়ি ফেলতে হয় যেখানে—'

মনোরথ ও-সব ছেঁদো কথায় কান দেয় না। ডিক্রিদারের থেকেও সে টাকা খেয়েছে। সে পরোয়ানার মর্ম্ম পড়তে শুরু করে।

বলদ, হাঁসা রঙ, হেলা শিঙ, লেজ ভাঙা—

মনো, চার আনা নিয়ে ছেড়ে দে। মনে করে দেখ, দুজনে রুইতাম একসঙ্গে। ধান এবার অপুষ্ট ও দাগী হয়েছে, নোনা উঠেছে জমিতে। চার আনা পয়সায় দুবেলার খোরাকি হত—'

অন্যায় মনোরথ করতে জানে না। সে কর্তব্য করতে এসেছে। টলাটলির ধার ধারে না সে।

একটা গরু ধলো, আরেকটা ধুসো। বাছুরটা পাটকিলে। ডিক্রি-দারের লোক জামিনদার হয়ে ধরে নিয়ে গেল। দুর্বল নাচারের মত তাকিয়ে রইল ক্ষেত্র। মনোরথ যেন নবাব-নাজিম, আর সে বাজে মার্কা। চুনোপুঁটির চেয়েও ছোট।

নাজির বললে, এ সাঁটে এবার দুটাকা দিতে হবে।'

মনোরথ বললে, 'আট আনা।'

আধুলিটা অতুল ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এবার ভালো হাওলা পেয়েছে মনোরথ, অনেক শাঁসালো পরোয়ানা। দখল, ইস্তাহার, অস্থাবর। সমন নোটিশের তো কথাই নেই। রিটার্নের দিন পেয়েছে লম্বা। এবার হাত কোট করলে চলবে কেন ?

'গরীব-গুর্বো লোক, বাবু, পেরে উঠয় না। ছেলেটার আমোশা হয়েছে, ডাক্তার নিয়ে যেতে হবে টাকা কবলে।'

তাতে অতুলের কি ? যা রেওয়াজ তা বজায় না রাখলে চলবে কেন ?

'বারো আনা বাবু—' মনোরথ হাত কচলায়।

অতুল ফিরেও তাকায় না। তোলো হাঁড়ির মত মুখ করে থাকে।

না, আর দরবিট করতে পারে না মনোরথ। যা হয় হবে, আর দিতে পারবে না সে নজরানা।

কিন্তু তত দূর যে হবে ভাবতে পারেনি সে কখনো। অতুল তার রোজনামচা নিয়ে পোকা বাছতে শুরু করেছে। ক'খানা পরোয়ানার

দিন মেরে দিয়েছে সে। গরহাজিরি জারি করেছে লটকে, অথচ বিবাদীর নাম নেই। বাঁসের আগালে পুঁতে দখল দিয়েছে, অথচ ঢোলসহরৎ হয়নি। মোকাবিলা সাক্ষীরা দেয়নি কেউই টিপটাপ। চৌকিদার দফাদারের টিকিরও সন্ধান করেনি। এমনি অনেক বায়নাক্কা।

মস্ত নালিশে মুসাবিদা করছে অতুল।

মনোরথ অতি কষ্টে এবার ছুটো টাকাই বের করে দেয়। অতুলের নজর এখন আরও উঁচুতে উঠেছে। তার মেহনতের দাম এখন আট টাকা।

গলায় কাপড় জড়িয়ে নেয় মনোরথ। কাঁদো কাঁদো মুখে বলে, 'রিপোর্ট করলেই সস্‌পেণ্ড হয়ে যাব বাবু। আপনার তাঁবে আছি আমরা। আপনি না দরগুজর করলে—'

কোনো অন্যায় করছে না অতুল। সে তার কর্তব্য করছে। যত ঢিলেমি যত জোচ্চুরি—সমস্ত কিছুই তার চৌকি দেবার কথা। মাঝে মাঝে খবরদারি না করলে কেউই সজুত থাকবে না।

কত ছুটো-ছাটা কাজ করে দিয়েছে সে অতুলের। গাছে উঠে নারকোল পেড়ে দিয়েছে। মফঃস্বল থেকে ডিম নিয়ে এসেছে ঝুড়ি-ঝুড়ি। ঘাটের নৌকা থেকে চালের বস্তা মাঝির সাথে হাত-ধরাধরি করে পৌঁছে দিয়ে এসেছে মাচার উপর। সেবার তাঁর মেজ ছেলেটার দমকা জ্বর হলে সমস্ত রাত জলধারানি দিয়েছিল সে একটানা।

কর্তব্যের কাছে আর কিছুর স্থান নেই। নালিশ নিয়ে অতুল চলে গেল হাকিমের খাসকামরায়।

'এ পাটালিখানার দাম কত নাজিরবাবু?' হাকিম জিজ্ঞেস করলে অতুলকে।

সাড়ে দশ আনা দাম, ছু পয়সা কমিয়ে অতুল বললে, দশ আনা।'

'ও!' পকেট থেকে হাকিম দশ আনা পয়সা গুনে দিলেন। গোনাটা ভুল হল কি না দেখবার জন্যে অতুলের হাতের চেটো থেকে পয়সাগুলি তুলে নিয়ে আরেকবার গুনে দিলেন।

তবু অতুল পাটালির দাম গ্রহণ করল।

'তালবেতের সুন্দর-সুন্দর মোড়া পাওয়া যায় এখানে, কয়েকখানা জোগাড় করে দিতে পারেন?'

অতুল পারে না কী। রঙ-বেরঙের জোগাড় করে দিলে। ক্ষীরোদ-বাবু মহা খুশি। হাত বুলিয়ে-বুলিয়ে দেখেত লাগলেন। কিন্তু অতুল হঠাৎ তাঁর খুশ মেজাজ চুরমার করে দিল। বললে, 'দাম সাড়ে চার টাকা।'

খড়ের আগুনের মত জ্বলে উঠলেন ক্ষীরোদবাবু। 'এত সব রঙচঙে আনবার কী হয়েছিল? আরেকটু ছোট দেখে আনলেও তো পারতেন।'

দপদপে খড়ের আগুন ক্রমে ক্রমে গুমরানো তুষের আগুনে এসে দাঁড়ালো। সাড়ে চার মাস পর অতুল দামের কথাটা মনে করিয়ে দিল।

ঘুরুনে বাতাসে অতুল হঠাৎ জলের ঘুরুলে পড়ে যায়। আসে উড়ো চিঠি। উপর হতে হুকুম আসে গোয়েন্দাগিরি করতে হবে।

ক্ষীরোদবাবু বড়করে ঘুরন-জাল ফেলেন। শোল-বোয়াল অনেক অকীর্তিই এসে আটকা পড়ে। এতদিনে বাগে পেয়েছেন ভেবে মনে মনে যেন বিশ্রাম পান।

শিরদাঁড়া নরম করে অতুল পাশে এসে দাঁড়ায়। খানিকটা বাঁকা ও অনেকটা কুঁজো দেখায়। শার্টের হাত দুটো রোজ কনুইয়ের কাছে গুটোনো থাকে, আজ কবজির উপরে নামিয়ে এনে বোতাম এঁটে দিয়েছে।

কিন্তু এর আর ছাড়াছাড়ি নেই। দফায় দফায় চুরি। নিলেমে, নৌকো ভাড়ায়, সাক্ষীসাবুদের খোরাকি ও রাহা-খরচে। পিওনদের

মাইনের উপর উনি মাসওয়ারী মাশুল বসিয়েছেন। আস্ত কড়িকে অন্তত কানা না করে কারু সাধ্যি নেই বেরোয় ওর খপ্পর থেকে।

সংসারে সমস্তই কি কর্তব্য? মায়া-মহব্বত বলে কিছুই কি নেই দুনিয়ায়?

'এ যাত্রা ছেড়ে দিন।' পায়ের উপর লুটিয়ে পড়তে পড়তে অতুল থেমে যায়।

কত যে কাজ করে দিয়েছে ক্ষীরোদবাবুর। প্রথম যখন আসেন, মালপত্র এসে পৌঁছয়নি, শিল-নোড়া বালতি ও বঁটি জোগাড় করে দিয়েছে। এখনো খোঁজ করলে তার একটা মগ পাওয়া যাবে, একটা বাচ্চা হ্যারিকেন। ভাঙা অপবাদ দিয়ে যা আর ফেরাননি তিনি ফেরাবেনও না কোনদিন। খুচরো নেই বলে একবার এক প্যাকেট সিগারেট কিনিয়েছিলেন তাকে দিয়ে, সে টাকা আর ইহজীবনে ভাঙানো হল না। কৃতজ্ঞতা বলে কিছুই কি নেই?

না, নেই, এমনি দোর্দণ্ড ক্ষীরোদবাবুর গোঁফ। সমস্ত অন্যায় ও শৈথিল্যের বিরুদ্ধে তা উদ্যত বাঁশ-ঝাড়।

যা থাকে অদৃষ্টে, পায়েই সে পড়বে আচমকা। কিন্তু তার নিচের লোক কী ভাববে? দেয়ালে কাণ পেতে দাঁড়িয়ে আছে যে, মনোরথ-মেনাজন্দিরা।

সাহেব এসেছেন পরিদর্শনে।

ক্ষীরোদবাবুর সঙ্গে পড়তেন এক কলেজে। বসতেন এক বেঞ্চীতে। থাকতেন এক হষ্টেলে, এক ঘরে, পাশাপাশি তক্তপোষে। তিনি খাস্তগির, উনি দস্তিদার।

এখন একেবারে চিনতেই চান না সাহেব। কর্মবাচ্যে কথা কন। আর যখন কর্তৃবাচ্যে আসেন তখন তাঁর একেবারে সংহারমূর্তি।

'আপনার টাইপ-রাইটার আছে?

"না—"

তোমার আবার টাইপ-রাইটার থাকবে—তুমি যা হাড়-কিপটে। সাহেবের চোয়ালের হাড়টা আঁট হয়ে ওঠে।

ঘুষ নিই না, ছেঁচড়ামো করি না, তাই কিপটেমি না করে উপায় কী—ক্ষীরোদবাবু, দাস্তে নুয়ে রইলেন।

খবর এল, খেয়া পেরুবার সময় সাহেবের মনিব্যাগটা জলে পড়ে গিয়েছে। বেশী নয়, শ খানেক টাকা।

'না, না, আপনাদের কাউকে ব্যস্ত হতে হবে না। অবিশ্যি, সদরে গিয়েই আমি পাঠিয়ে দিতুম ফেরৎ ডাকে। না, তবু আপনাদের ব্যস্ত করে লাভ নেই। সামান্য পঁচিশ-তিরিশ টাকা হলেই—তা, যাক, সে এক রকম চলে যাবে 'খন।'

অনেক পরে টনক নড়ল ক্ষীরোদবাবুর। যখন সাহেব চলে যাচ্ছেন, ট্রেনে উঠেছেন। কি একটা লেখবার জন্যে কলমের খোঁজ করলেন। বিনা দ্বিধায় ক্ষীরোদবাবু বাড়িয়ে দিলেন তাঁর ফাউন্টেন-পেনটা।

সাহেব তা স্পর্শও করলেন না। ফাউন্টেন-পেনটা খেলো, পুরোনো, দাগধরা।

অমৃতের স্বাদ পেলেন। রিপোর্ট এল পরিদর্শনের। হাতের লেখা বিতিকিচ্ছি, টাইপ-রাইটার না হলে চলবে না এক পৃষ্ঠা। তা ছাড়া কাজকর্ম একেবারে কাছা-খোলা, ল্যাজে-গোবরে। ঝুড়ি-ঝুড়ি গলতি, ভূরি ভূরি গাফিলি।

এবার ক্ষীরোদবাবু, কয়েক ঘর কেঁচে যাবেন সন্দেহ নেই। কর্তব্য ও শাসনের কাছে কোন বন্ধুতাই ঠেকা দিতে পারবে না।

তবু একবার যেতে হয় সদরে। মনে করিয়ে দিতে হয় একদিন এক সঙ্গে পড়লেও কত অধম অধস্তন হয়ে আছি। কেউ কোথাও না থাকলে জড়িয়ে ধরবেন না—হয়ত তাঁর হাত দুখানি।

আর মেম-সাহেবের সঙ্গে গোপনে দেখা হলে, দু'হাত ঠিক জড়িয়ে না ধরলেও, মৃদুস্বরে ডাকবে, না-হয় তাকে তার ডাক-নাম ধরে। বলবে, পূর্ব কথা স্মরণ না করো, আজকের কথা ভেবেই কৃপা করো, করুণাময়ী। তোমাকে যে নিয়ে আসিনি আমার গোয়ালে বিচালির ধোঁয়া দিতে, তোমাকে যে জায়গা করে দিয়েছি তখত-তাউসে, যৌতুক দিয়েছি যে হুজুরী তালুক, ভার্য্যা না করে যে আর্য্যা করেছি, সেই কথা ভেবেই একটু অনুকূল হয়ো।'

পারঘাটে অতুল-আতিয়াররা দাঁড়িয়ে আছে। উপায় কি। ছাতা আড়াল দিয়ে যেতে হবে ঘাড় গুঁজে।

এই সেই কোকিল স্বর। মেম সাহেবেরই রেশমী গলা। 'ব্যেরা' 'জী।'

ক্ষীরোদবাবু ভাবছিলেন তিনিই বেয়ারাকে জিগগেস করবেন কোথাও একটু দেখা হতে পারে কিনা নিভৃতে। কে জানে, পর্বতই হয়তো আসছেন মেঘ হয়ে।

'নীচে যে টাইপ-রাইটারের এজেন্ট এসেছে তাকে বলে দাও আমাদের জোগাড় হয়েছে দুটো, এখন আর দরকার নেই—'

"মধুর বলিয়া ছানিয়া খাইনু তিতায় তিতিল দে।" ক্ষীরোদবাবুর পদাবলী মনে পড়ে গেল।

স্পেশাল সেলুনে উজির আসছেন। ট্রেণ মাঝরাতে এসেছে, তাঁর সেলুন আছে সাইডিঙে, ভোর সাতটায় তিনি অবতরণ করবেন। সকাল হতেই সাহেব গোলাম ও তুরুব-ফেরাই জড় হতে লাগল। কিন্তু খোদ সাহেব মিষ্টার দস্তিদারের দেখা নেই।

উজির আগেই নেমে পড়েছেন। রাতের দলামোচা পোষাকেই। দাঁত না মেজে, খেউরি না হয়েই।

দেরি হয়ে গেছে নিশ্চয়ই, প্ল্যাটফর্মে ঢুকেই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন দস্তিদার। নিচু হয়ে, ঘাড় নোয়াতে নোয়াতে।

'এত দেরি তোমার।' ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন উজির। করমর্দনটা উত্তপ্ত হতে দিলেন না।

দস্তিদারও দস্তবস্ত হয়! মুখে কাঁচুমাচু করে বললেন, সাতটা এখনো বাজেনি।'

'বাজেনি?' উজির তাকালেন ঘড়ির দিকে। দেখলেন ঘড়িটা বন্ধ হয়ে আছে। স্প্রিংটা কাটা।

মুখ গোঁমসা করে রইলেন। পটকা ফুটছে, তোপ দাগা হচ্ছে না। বাজছে মোটে বিউগল, জগঝম্প নয়। শালুর মোটে একটা গেট, আর সবগুলো দেবদারু পাতার। শালুর গেটের 'ওয়েলকামের' তুলো খসে-খসে পড়ছে। চেঁচাড়ির গেট বেঁকে রয়েছে তে-ব্যাকার মত। তেমন কোনো হৈ-হল্লা হচ্ছে না, নিশান হাতে মিছিল করছে না ছেলেরা। এই ব্যবস্থা! তিনি যেন উটকো লোক এসেছেন, তিনি যেন কেউকেটা!

এরো ব্যবস্থা আছে! খোল-নলচে বদলাতে না পারলেও কলি ফিরিয়ে দিতে পারবেন। অন্তত বেমক্কা জায়গায় পারবে ঠেলে দিতে।

উকিল ছিল আগে। মক্কেলের ট্যাঁক হাতরে ও কাছা টেনে বেড়াত। নাইকুণ্ডে এক গাদা তেল ঢেলে গামছা পরে চান করত নদীতে। একবার অনেক দিন আগে দস্তিদার তাকে তাঁর কোর্ট থেকে বের করে দিয়েছিলেন। মাপ চাইতে এলেও বসতে চেয়ার দেন নি।

আজ দান পড়েছে উলটো। ভূতনাথ দেবনাথ আজ চোখ পাকান আর দস্তিদার দস্তবরদারের মত হাত কচলান। আশাসোঁটা নিয়ে চলেন পিছু পিছু খাসবরদারের মত!

আশ্চর্য, চাকা ঘুরছে গোল হয়ে! বৃত্ত-বলয় সম্পূর্ণ হল এত দিনে।

ভূতনাথ দেবনাথ ক্ষেত্র দুয়ারীর দুয়ারে এসে উপস্থিত। তার সেই নাড়াকুচির ঘরে। গরুচোরের মত।

গোবরলেপা মেঝের উপর চ্যাটাই পেতে বসলেন ভূতনাথ। গরম মসলা নয় আজ একেবারে, রোগা পেটে পলতার ঝোল।

শক্তিধর, মহীধর বলে নিজেকে আজ মনে করল ক্ষেত্রনাথ। সে আজ আর নরম মাটি নয় যে বেড়ালে আঁচড়াবে। সে এখন শক্তঘানী জোরদার, জবরদস্ত।

রাজা-উজীর সবাই আজ তার করুণার ভিখারী। তার কথায় ওঠে-বসে, হেলে-দোলে। সমস্ত পৃথিবী এখন তার করধৃত আমলকী।

'এবারে ভোট কিন্তু আমাকে দিতে হবে, ক্ষেত্তর।' ভূতনাথ ক্ষেত্রর ঘেমো পিঠে হাত রেখে একটু আদর করে। 'শুনতে পাই এ অঞ্চল তোর এক্তারে। সব ভোট আমাকে জোগাড় করে দিতে হবে কিন্তু। জানিস তো, আমার চেন্না হচ্ছে কাস্তে। ও-সব লণ্ঠন সাইকেল নয়, কাস্তের বাক্সে কাগজ ফেলবি। তোদের যা আসল জিনিস—সেই কাস্তে-কাঁচি।'

ক্ষেত্র মাথা নাড়ে, মুখ টিপে-টিপে হাসে। বেড়ার গায়ে গোঁজা কাস্তের দিকে তাকায়।

সাহেবের মা

'তোমার নাম কী ?'

'সাহেবের মা।'

নাম শুনে হুমায়নবীশ একটু চমকাল বোধহয়। বোধহয় বা চেহারার সঙ্গে মিলিয়ে। ঘর-দোরের সঙ্গে।

এখন আর অবিশ্যি ঘর নেই। সমস্ত বেড়াটাই এখন দরজা হয়ে গেছে। দাবার উপর আছে একটু চালের অবশেষ। বাঁশের দুটো খুঁটি আছে এখনো আঁট হয়ে। একটাতে ঠেস দিয়ে বসে আছে সাহেবের মা। বুড়ি, আধ-পাগলা। হাতের কাছে একটা শুকনো শূন্য বাটি।

'কে আছে তোমার ?'

'কেউ না।'

'কে ছিল ?'

'তিন ছেলে ছিল। আর ছিল আল্লা।'

'কেউ নেই ?'

'কেউ না।'

অমূল্য থামল। বললে, 'গেল কিসে ?'

'তিনটেই খেয়ে।'

'খেয়ে ?'

'হ্যাঁ, অখাদ্য খেয়ে। ঘাস-পাতা ছাতা-মাথা খেয়ে। এখানে-ওখানে যেখানে যা পেয়েছে তাই পেটে ঢুকিয়ে। শত্তুরদের পেটে কী যে দস্যু খিদে ছিল—'

'শেষ পর্যন্ত তো কলেরাতেই মারা গেল—'

'তাই লেখ। ওরা যখন নেই তখন কে বলতে আসছে কিসে ওরা গেল ?'

'কিন্তু আল্লা গেল কোথায় ?'

'সে গেছে তোমাদের পকেটে। কোঠাবাড়িতে।'

অমূল্য হাসল। বললে, 'কি করে খাও এখন ?'

পা দিয়ে বাটিটা ঠেলে দিয়ে বললে সাহেবের মা, 'ভিক্ষে করে।'

'শোনো। যার জন্যে আমি এসেছি—'

এই পাশের গাঁ, ডুমুরতলায় একটা তাঁতখানা বসেছে, সঙ্গে আছে চাঁচবাঁখারির কাজ, তালবেতে মোড়া-চেয়ার টুকরি-টুপি বানানো। কি হবে ভিক্ষে করে? তুমিও এসো না, কাজ করবে আমাদের সঙ্গে।

আঙুলের গাঁটে গাঁটে চামড়া আছে কুঁচকে। বুড়ি বললে, 'আমি কী কাজ করব ?'

'কেন, কাগজের ঠোঙা বানাবে। শিখিয়ে দেব আমরা। খাওয়া পাবে মাগনা। আর রোজ পয়সা পাবে ছ'আনা করে।'

সাহেবের মা জগৎসংসারকে বিশ্বাস করিতে চাইল না। খাওয়া, খাওয়ার উপরে আবার ছ'আনা পয়সা!

'হ্যাঁ, পয়সা দিয়ে আবার তোমার ঘর তুলবে।' কথাটা বলতেই অমূল্যর কেমন ফাঁকা ঠেকল বুকের ভেতরটা। সেই তৈরি ঘরের তীক্ষ্ণ শূন্যতার নিশ্বাস লাগল তার হাড়ের মধ্যে।

ঝড় নেই, তুফান নেই, বান-বন্যা নেই, অথচ ঘর পড়ে গেছে। যেন কতগুলো বুনো নেকড়ে দল বেঁধে চলে গিয়েছে এখান দিয়ে, সব দলে-পিষে ছত্রাকার করে দিয়ে। ক্ষুধার নেকড়ে।

বুড়ি রাজি হয়ে গেল সহজেই।

কে না রাজি হয়! মাগনা খাওয়া পাবে, উপযুক্ত মজুরি পাবে, রাজি না হবার কোনো মানে হয় না।

চাঁড়ালরা রাতে ঢেঁকিতে চিড়ে কুটত, এখন কেরোসিন পায় না, জ্বলে না আর টেমি বা বাঁশের চোঙার কুপি। তারা এল। সরষে নেই, ঘানি ঘুরছে না কলুদের, তারা এল। সিউলিরা তাল খেজুরের

গুড় তৈরি না করে তাড়ি তৈরি করছে, এল তারা কেউ-কেউ। কাগজীরা খড়-বাঁশ-শর জোগাড় করলেও পাচ্ছে না কাগজ-তৈরির মশলা, তারাও নাম লেখাল।

গ্রামের পুনরুজ্জীবন হচ্ছে। শ্মশানকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে গঞ্জ-গোলায়। পাণ্ডুরকে শ্যামলে।

কাঁচা মাটির ঘর উঠেছে কতগুলো, কঞ্চিতে কাদার চাপড়া লাগানো দেওয়াল। তাঁত বসেছে ক'খানা, তৈরি হচ্ছে গামছা আর টেবল-ঢাকা। তৈরি হচ্ছে বাঁশের মোড়া আর ঝুড়ি, খাল্লা আর ডোল, টপুর আর ধানের হামার। তৈরি হচ্ছে কাগজের ঠোঙা! লাগোয়া জায়গায় তৈরি হচ্ছে শাক-শবজি।

অমূল্যর ভীষণ উৎসাহ। সরকারী সহানুভূতি পর্য্যন্ত সে আদায় করেছে। যারা সহরে-গাঁয়ে ইজিচেয়ারে শুয়ে নিজেদের মান-মুনাফা ঠিক রেখে বাঁধা-বাঁধা বুলি কপচায় তাদের কাউকে কাউকে টেনে নিয়ে এসেছে এই কাজের ঘূর্ণিপাকে। কিন্তু এক এক সময় বড় শ্রান্ত লাগে অমূল্যর। মনে হয় নিজেকে স্তোক দিচ্ছে সে। গ্রামের উজ্জীবন। কিন্তু গ্রামকে ধ্বংস করল কে? আজ গ্রামকে খাড়া করলে কালই যে সে ফের ধ্বংস হয়ে যাবে না তার ঠিক কি? আজ রুগ্নের মুখে জল দিচ্ছে। কিন্তু রোগ যাতে চিরদিনের মত উচ্ছেদ হয়ে যায় তার সে করছে কী?

বিশাল বটগাছের তলায় বসে থাকে সে নিরিবিলি।

না, এই বা কম কী! ঐ যে থাবা-থাবা খাচ্ছে এখন সাহেবের মা।

সাহেবের মা হামড়ি খেয়ে পড়ে ভাতের পাতের উপর। ভাবে, খাওয়াটা কত সহজ, কত জানা জিনিষ। ধান কেঁড়ে চাল ফুটিয়ে ভাত, ফেনালো ভাত, আর যদি দাও একটু নুনের ছিটে। আর না খাওয়াটা কত রাজ্যের পথ, আর কী নির্জ্জন সে পাথরের রাস্তা। তাড়াতাড়ি

খেয়ে নিতে হয় সাহেবের মাকে, আর সবাইকে পিছে ফেলে। খিদের তাড়নায় নয় ভূতের তাড়নায়। তিনখানা কঙ্কালসার হাত তার দিকে হঠাৎ এগিয়ে এসেছে।

এরা একবেলা খেতে দেয়। স্বাদ পেয়ে সাহেবের মায়ের সাধও যেন বেড়ে যায়। নগদ পয়সার থেকে সে খই কেনে, চিনির বাতাসা কেনে। কিছু খায় কিছু বা রেখে দেয় কাগজের ঠোঙায়।

সেদিন বিকেলের দিকে হটাৎ একটা সোরগোল উঠল। শোনা গেল মোটরের ঝকঝকানি।

'সাহেব এসেছে, সাহেব এসেছে।'

ঠোঙা বানাচ্ছিল সাহেবের মা। তার পাশে ছিল মোক্ষমণি। সে বললে ফিস-ফিসিয়ে 'তোর ছেলে এসেছে সাহেবের মা।'

'ছেলে?' সাহেবের মা চেঁচিয়ে উঠল। 'শুনছিস না সাহেব এসেছে? তুই যদি সাহেবের মা হোস, ও তো তবে তোর ছেলে!' মোক্ষমণি হাসল মুখ টিপে।

আশ্চর্য্য, তার একটা ছেলের নামও সাহেব ছিল না। মেনাজ, ইছব আর সদরালি—তার তিন ছেলে। একটার নামও অন্ততঃ সাহেব থাকা উচিত ছিল, নইলে কিসের সে সাহেবের মা? উপায় কি, যখন বাপ তার নাম রেখেছে, তখন কোথায় সাহেব! বাপ তার ভুঁই রুইত, বোধ হয় আশা করেছিল নাতি তার লাটসাহেব হবে। অন্ততঃ আশা করেছিল সাহেব নামে সৌভাগ্য আসবে তার মেয়ের সংসারে।

সে সাহেবের মা, অথচ ছেলে তার কেউ সাহেব নয়, এই অসঙ্গতিটা আজ কেমন লাগল তার বুকের মধ্যে।

জীরেশ এ মহকুমার ছোকরা মুনিব। এসেছে পরিদর্শনে।

তাকে পেয়ে অমূল্য মহা খুসি। কৃতকৃতার্থ। খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখাচ্ছে সব কাজকর্ম্ম। তাঁতের, বাঁশ-বেতের, ঠোঙা-ঠিলির।

'খুব ভালো কাজ হচ্ছে।' দাঁত চেপে বললে জীবেশ মুরুব্বিয়ানার সুরে।

'তবে আরো দেখুন। এই শাকপাতাড়ের খেত। ফুল যা দেখছেন সব আহার্য্য ফুল।'

'সন্ধ্যে হয়ে গেছে। আজ এই পর্য্যন্ত থাক।' জীবেশ মৃদু হাস্যে আপত্তি করল।

'আর একটু। এই দেখুন বাঁশের জাফরির কাজ। গোলোকধাঁধা নক্সার সিলিং।'

'এবার যাই অমূল্যবাবু। আফিস থেকে এখনো বাড়ি যাইনি। খিদে পেয়ে গেছে।'

এ ছেলেমানসি ধরণের কথাটা কেউ তেমন খেয়াল করল না, কিন্তু লাগল গিয়ে ঠিক সাহেবের মার হৃৎপিণ্ডে। সন্দেহ কি এ তারই ছেলে। বলছে, খিদে পেয়েছে। বলছে, খেতে দাও কিছু।

কার কাছে বলছে?

কার কাছে আবার! সন্তান আবার কার কাছে বলে!

সন্দেহ কি, এ তারই ছেলে। পোষাক-আসাক বদলে যেতে পারে, বদলে যেতে পারে ধরন-ধারন, কিন্তু গলার স্বর বদলায়নি একটুও। বলে, খিদে পেয়েছে, খেতে দে, মা। তার মেনাজ-ইছব-সদরালি না হতে পারে, কিন্তু তার সাহেব,—যে ছেলে তার মরেনি এখনো। ক্ষিদেতে ধুঁকছে, কিন্তু মরেনি এখনো। সে যে মা, সাহেবের মা।

জীবেশ উঠছে তার মোটরে সাহেবের মা কাগজের ঠোঙায় চিনির বাতাসা নিয়ে এল তার সামনে। ঠোঙাটা মুখের কাছে বাড়িয়ে ধরে বললে, 'নে, খা।'

জীবেশ পিছিয়ে গেল দু'পা। সবাই বোকা, হতভম্ব হয়ে গেল।

'তোর খিদে পেয়েছে বলছিলি না? নে খা, খিদের কাছে

আবার লজ্জা কী।' আশে-পাশের লোককে জীবেশ জিগগেস করল, 'কে এ?'

সবাই বললে, পাগলি।

'ছেলের খিদের কথা শুনে কোন মা না পাগল হয় শুনি?' সাহেবের মা হাসল অদ্ভুত করে: 'নে, হাঁ কর, আমি খাইয়ে দি হাতে করে।'

জীবেশ তবু মুখ ফিরিয়ে রইল। সবাই হাই-হুই করে সাহেবের মাকে চেষ্টা করল হটিয়ে দিতে। কেউ বা টানল তার হাত ধরে। জলে হঠাৎ চোখ দুটো তার খুব উজ্জ্বল দেখাল। বললে, 'আমাকে চিনতে পাচ্ছিস না সাহেব? আমি যে তোর মা—সাহেবের মা। আমার একটা ছেলে এখনো বেঁচে আছে, কাঁদছে খেতে দাও বলে। আর তুই—'

না, চিনতে পেরেছে। সন্তানকে মা চিনলে মাকে সন্তান চিনবে না? জীবেশ দরজা খুলে দিল মোটরের। বুড়িকে তুলে নিল ভিতরে।

লোকে যা ভেবেছিল, তার উলটো হল। ভেবেছিল বুড়িকে হাতের ধাক্কায় ঠেলে দিয়ে চলে যাবে জীবেশ, কিন্তু না, একেবারে তুলে নিল গাড়িতে। দয়ার শরীর আছে সাহেবের।

'বা ও সাহেব যে। মার ছেলে।' বলে উঠল মোক্ষ[illegible]।

তার বাবা আর তার নাম মিথ্যে রাখেনি। তার [illegible]হেবের কত সুন্দর বাড়ী, কেমন সুন্দর বাগান। কেমন চমৎকার হাও[illegible]-গাড়ি।

বাড়িতে পা দিয়েই জীবেশ চেঁচিয়ে ডেকে উঠল: 'মা, মা।' ডাকতে-ডাকতে চলে গেল ভিতরে।

ডাকটা একটা দগ্ধ শেলের মত লাগল এসে সাহেবের মার বুকে। এ যেন খিদেয় কাতর হয়ে মার কাছে খেতে চাওয়ার ডাক নয়। এ যেন অন্য রকম। এ যেন আনন্দের ডাক, অহঙ্কারের ডাক।

বাঙলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে সাহেবের মা তাকাতে লাগল চার পাশে, ঝাপসা অন্ধকারে। তার চোখে যেন আর সেই আশ্বাস নেই। কেমন ভয়-ভয় ভাব। যেন কোন অজানা বিরানা জায়গায় চলে এসেছে সে। যেন বালির উপরে রোদ্দুরে তার জলভ্রম হয়েছে।

'এই যে মা, এই যে। ভারি অদ্ভুত—' তার সাহেব বাড়ির ভিতর থেকে ডেকে নিয়ে এসেছে আর কাউকে।

তারই মত বুড়ি। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর। সত্যিকারের মার মত। পিরতিমের মত। কাঁচা-পাকা চুলে লাল টকটকে সিঁদুর চওড়া কস্তাপেড়ে শাড়ি, গা ভরা গহনা। ঝকমক করছে, গনগন করছে।

'আহা, বেচারি—' জীবেশের মা বললেন সাহেবের মাকে। 'নিজে খেতে পাচ্ছিস না, তাই পরের খিদেয় প্রাণ পোড়ে। বোস্, সরে বোস্ ওখানটায়। তোর জন্যে খাবার নিয়ে আসছি আমি। আর, কাপড় নিবিনে একখানা? বোস বোস ওই নীচে নেমে।'

জীবেশ ও জীবেশের মা চলে গেল ভিতরে।

ছেলেকে খেতে দিয়ে জীবেশের মা বুড়ির জন্যে কলাপাতায় করে খাবার নিয়ে এলেন, নানারকম খাবার; কিন্তু বুড়িকে কোথাও দেখতে পেলেন না। না বারান্দায়, না বা নীচে, বসতে বলেছিলেন যেখানটায়। অন্ধকারে চলে গিয়েছে কোন দিকে। শুধু একটা কাগজের ঠোঙা রেখে গিয়েছে দরজার কাছে। তাতে কটি ভাঙা গুঁড়ো-গুঁড়ো চিনির বাতাসা।

ফেরা-ফিরতি

দেয়ালে টাঙানো সুশীলার একটা ফটো আর ভারতবর্ষের মানচিত্র। নগেনের তখন সেই বয়েস যখন লোকে প্রিয়া ও পৃথিবীকে সমান চক্ষে দেখে থাকে।

নগেনের বয়েস পঁচিশ, বি এ পাশ। পৃষ্ঠপটটা মামুলি রকমের সাদা। বাপ সর্বজয় মৌলিক নিম্ন আদালতে ওকালতি করতো। মারা গেছে সম্প্রতি। সবুজ গাউনের ছেঁড়া ক'টি আশ ছাড়া কিছুই বিশেষ রেখে যেতে পারেনি। নগেনের পর ভাইয়ে-বোনে আরো পাঁচটি, শেষের তিনটি নাবালক। আর মা। বিধবা খুড়িমা আছে সংসারে। তাঁর ছেলেটা আবার হাবা। মেয়েটা স্বামীর পা-ঠেলা।

নগেনের মাথায় গন্ধমাদনের ভার। সে চালাবে কি করে এত বড় রাজসূয়? তার একটা ইস্কুল মাষ্টারিও জোটেনি, একটা জমানবিশি পর্য্যন্ত। অথচ তার কাজের কিনা অন্ত নেই। সমস্ত কিছু ভণ্ডুল করাই তার কাজ। ও-পাড়ার ছেলেরা নতুন ক্লাব করছে, দাও এটাকে ভেঙ্গে; পূজা-কমিটির সেক্রেটারি তার মনের মতো হয়নি, হ'তে দিও না এবারের পুজো। আশু ডাক্তার ডাক্তারিতে ঢিল দিয়ে মিউনিসি-প্যালিটির ভোট নিয়ে মাতামাতি করছে, দাও ওর সাইকেলটা ফুঁটো ক'রে। শহর থেকে থিয়েটার এসেছে, ট্রেন থেকে নামতে না-নামতেই ঢিলের পুষ্পবৃষ্টি। পাটের গুদোমকে সিনেমা-হাউসে বদলে দেওয়া হয়েছে একদিনে, এক রাতেই ঝড়ের তোড়ে উড়ে গেল তার টিনের চাল। মুন্সেফ আর সাব-ডিপটি মিলে বারোয়ারিতলার জমিতে ব্যাডমিণ্টনের কোর্ট কেটেছে, হাল দিয়ে দাও ওটাকে নিশ্চিহ্ন করে। কিছু একটা তার চোখের সামনে অকারণে গ'ড়ে উঠবে এ যেন নিছক প্রহসনের মতো।

'কিছু একটা গ'ড়ে তুলতে পারে না, পারে শুধু ভাঙতে।' হিতৈষীরা চাপা গলায় টিপ্পনি কাটে।

দাঁতের ফাঁকে উদাসীন হাসি হেসে নগেন বলে: 'তেমন ক'রে গড়লে কী আর ভাঙতে পারতুম! ভাঙাটা তো আমার কৃতিত্ব নয়, যেটাকে ভাঙি তার বনেদের দোষ।'

'অকর্মণ্য!'

'তার চেয়ে শুদ্ধ ক'রে বলুন, কর্মহীন। নিষ্কর্মাদেরই তো বেশি কাজ।'

বাপ মারা যেতে হিতৈষীদের মুখ উদ্ভাসিত হলেও নগেন দেখলো অন্ধকার। ঝড়ের তোড়ে চাল উড়ে গেছে এমন মনে হলো না, মনে হলো যেন পাহাড় ভেঙে পড়েছে মাথার উপর। শূন্যতা নয় নিশ্ছিদ্রতা। কিন্তু গন্ধমাদন পর্বতে নেই কি কোথাও বিশল্যকরণী? অন্ধকারে একটিও তারা?

আছে। কিন্তু ভয়ানক অসঙ্গত মনে হয় না কি?

এখানকারই উকিল অনাথ দত্তের মেয়ে। কোলকাতার কলেজে পড়ে। ছুটিতে আসে, নতুবা চিঠি লেখে। তটরেখা ক্রমেই যেন স্পষ্ট হয়ে আসছে। দেখা যাচ্ছে সবুজের ভূমিকা। ঢেউ ক'মে এসে মাটীর সহিষ্ণুতা। শুধু এইখানেই কি নগেনের নির্মিতির স্বপ্ন? একটি ভিত্তি-পত্তনের দুর্বলতা?

মার কাছে খবর পেলো বাবা জমি রেখে গেছেন বিঘে দশেক। দুই কেতা জমি, দুই গাঁয়ে। এক কেতা জমি বন্ধকী সুদের দায়ে এখনো তারা ভোগ-দখল করছে, নিজ লাঙলে, আরেক কেতা বাবা মরবার আগেই গেল-বছর নিলাম খরিদ করে বাঁশগাড়ি দখল নিয়ে রেখে গেছেন বর্গায়। একেবারে তবে পথে বসেনি নগেন। ইনসিও-রেন্সের এজেন্সি না নিলেও হয়তো চলবে, কিংবা গানের মাস্টারি। সম্বৎসরের ধান আসবে মাঠ থেকে, কিছুটা বা মোটা কাপড় হয়ে। এইখানে বুঝি বা তার ফসলের স্বপ্ন। তার ক্ষুধামোচনের দুর্বলতা।

'দেখুন, আপনাকে শুধু একটা অনুরোধ করতে এসেছি।' নগেনকে বিস্মিত হবার সময় না দিয়েই কে-এক ভদ্রলোক বাইরের ঘরের তক্তপোষের একধারে ব'সে পড়লো। হাফ-সার্ট ও সর্টসে খুব একটা তেজী চাকরির লোক ব'লে মনে হচ্ছে।

জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইলো নগেন। কত কি কোথায় অন্যায় করেছে এক নিশ্বাসে ভেবে উঠতে পারলো না।

'তেমন কিছু কঠিন হবে ব'লে মনে হয় না।' যেন নগেনের চেহারার দিকে চেয়ে কিছু একটা আঁচ ক'রে আগন্তুক স্বগতোক্তি করলে। 'আপনিই তো নগেনবাবু?'

'হ্যাঁ; আর আপনি?'

'আমার নাম প্রিয়নাথ মালী—এখন অবিশ্যি মল্লিক হয়েছি। সানাররা যেমন সেন হচ্ছে।' ভদ্রলোক মৃদু হাসলো, কিন্তু আলোর এতটুকু রেখাপাত হলো না।

নগেন হাত তুললো ঘাড় চুলকোবার জন্যে।

'আমি মালদার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, মালদার মানে মাতাল ভাববেন না যেন, এই সদ্য জয়েন করেছি। এখন অবিশ্যি প্রোবেশনায়।' প্রিয়নাথ একটা সিগারেট ধরালো।

নগেনের হাত ঘাড়ে না গিয়ে পৌঁছুলো এসে গালের উপর।

'সুশী—সুশীলাকে আপনি চেনেন নিশ্চয়ই।'

'কেন, কোথায় সে?' নগেনের গলাটা অত্যন্ত মিহি শোনালো।

'যেন, তেমনি আছে সে হস্টেলে। তার এবার আই-এ। প্রথম পরীক্ষাটা দেবে না ভেবেছিলো, এখন দেখছি খুব কোমর বাঁধছে—'

'তা আমার কাছে কেন?'

'বা, সেই তো আমাকে পাঠিয়েছে আপনার কাছে!'

'আমি কী জানি?' সমস্ত কিছু যেন নগেন ঝেড়ে ফেলে দিতে

চাইলো গা থেকে। একটা কিছু যে কোথাও বিপদ ঘটেছে তাতে সন্দেহ নেই। নইলে তার ঘরে কেন এই পুঁটি-ডেপুটি ?

যা ভয় করেছিলো নগেন। প্রিয়নাথ একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে জিগ্যেস করলে : 'আপনি তো সুশীলাকে ভালোবাসেন ?'

'বা, আমাদের গাঁয়ের মেয়ে, প্রথম গ্রাজুয়েট হতে চলেছে, ভালোবাসবো না ? কত সাঁতার কেটেছি পুকুরে দু'জনে, কত ফল পেড়েছি গাছে উঠে—'

'না, আরো পরেকার পরিচ্ছেদ। সে ভালোবাসাটা আপনার গভীর, অতল-সঞ্চারী—'

নগেন মূঢ়ের মতো তাকিয়ে রইলো।

'সে ভালোবাসার সাহসেই আসতে পেরেছি আমি আপনার কাছে। আসতে পেরেছি আমি সুশীলার হয়ে একটি অনুরোধ করতে।'

নগেন এবার টগবগ ক'রে উঠলো। বললে, 'সুশীলার হয়ে অনুরোধ—বলুন, নিশ্চয়ই অসাধ্য হবে না।'

'বিশেষ কিছু নয়,' প্রিয়নাথ স্পষ্ট, নিশ্চেষ্ট গলায় বললে, 'আপনার কাছে সে যত চিঠি লিখেছে এতদিন, তা সে ফেরৎ চায়।'

'ফেরত চায় ?' নগেন এতটা কল্পনা করতে পারতো না।

'হ্যাঁ, অন্তত যেগুলো দোষের সেগুলো আমাকে বেছে নিয়ে যেতে বলেছে।'

'দোষের ?' নগেনের আবার কেমন একটা অস্পষ্ট ভয় হলো। ঢোঁক গিলে বললে, 'তার মধ্যে রাজনীতি তো কিছু নেই।'

'তা নেই, কিন্তু অনেক নাকি দুর্নীতি আছে। ছেলেমানুষি না ব'লে মেয়েমানুষি বলতে পারেন। একটা বয়েস থাকে ওরকম লাফালাফির। সেটা ক্ষমার যোগ্য। কিন্তু সম্ভ্রান্ত হবার পর ও-সব নিদর্শন তৃতীয়

ব্যক্তির হাতে থাকতে দেয়াটা ঠিক নয়। একদিন সেটা হয়তো স্বাদ থাকে, অন্ত দিন সেটাকে দেখায় নির্লজ্জতার মতো।'

এত ঘোরালো ব্যাপারে নগেন অভ্যস্ত নয়।

'দেখুন, এই সুশীর চিঠি।' প্রিয়নাথ বাড়িয়ে ধরলো একটা ভারী, রঙিন খাম।

আশ্চর্য্য, নগেনকেই লেখা। খুব দ্রুত, দৃঢ়, অথচ তেমনি গোল-গাল কোমল অক্ষর। সেই সৌরভ এখনো ছড়ানো আছে বাতাসে। চিঠির কাগজও তেমনি। শুধু খামটাই নতুন।

খুব অসাধারণ অথচ খুব মামুলি। খুব জটিল অথচ খুব বিশদ। সুশীলা চিরকালই ব্যক্ত, উচ্চারিত, তাই এখানেও সে কিছু ধান ভানতে শিবের গীত করেনি। প্রিয়নাথকে সে বিয়ে করেছে, রেজেষ্ট্রি করে, কাউকে না জানিয়ে। নগেন তো জানে তার বাবা তার বিয়ের ব্যাপারে যেমন অসমর্থ তেমনি উদাসীন। অসমর্থ ব'লেই উদাসীন। সে দু'-দুবার প্রাইভেটে আই-এ ফেল ক'রে বাড়িতে বসে পচছিলো এতদিন, প্রজাপতি ঘুরে ঘুরে উড়ে যাচ্ছিলো বার বার। তারপর একদিন সে বাড়ির সবাইর সঙ্গে ঝগড়া ক'রে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে কোলকাতা চলে আসে কলেজে প'ড়ে পাশ করবার জন্যে, নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্যে। বলতে কি, নগেনই তাকে এই ভাঙনের মন্ত্র দিয়েছিলো, এই বাসা-ভাঙার মন্ত্র। এই মন্ত্রের জোরেই সে সমাজ ভেঙে দিতে বসেছে, বিয়ে করেছে, যাকে বলে, অস্পৃশ্যকে; প্রচণ্ড ভাষায়, চণ্ডালকে। সমাজকে তো এখন এমনি ক'রেই বড় করবার দিন।

নগেনের মনে হলো সেও যেন সব এমনি ভেঙে দিতে পারে, ছত্রাকার ক'রে দিতে পারে সব বিধিব্যবস্থা। পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত অনুভব করলো সে একটা আক্রমণের অধৈর্য্য।

কিন্তু নগেনকে তার বড় ভয়—সুশীলার চিঠি ওখানেই শেষ হয়নি—

বড় ভয় তার নগেনের অসহিষ্ণুতাকে। পাছে সে গণ্ডগোল বাধায়, ভণ্ডুল করতে মনস্থ করে। তার কুমারীজীবনের প্রগলভতার কিছু প্রমাণ নগেনের কাছে আছে কতগুলি চিঠিতে, কুয়াসাহীন অনাবৃতি— সেগুলি সে ফেরত চায়। যা হারিয়ে যায় তা আগলে ব'সে থেকে লাভ নেই, এ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বাণী। পায়ের চিহ্ন পথের ধুলাতেই মুছতে দেওয়া উচিত। চিঠিগুলি যেন সে সুতরাং দয়া করে ফেরত দেয়। সুশীলা অক্ষম। সুশীলা ক্ষমাপ্রার্থিনী। নগেন মহৎ, প্রশস্তচিত্ত।

নগেন এক ফুঁয়ে নিবে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। যেমন বিশেষ কোন মুহূর্তে স্নায়ু নিরুচ্ছ্বাস হয়ে থাকে। মনে হলো যেন কোথাও নোঙরের টান নেই। এসে পড়েছে তীরতরুহীন জলের শুভ্রতায়। ভাসবে না ডুববে বুঝতে পাচ্ছে না।

সম্ভ্রমের সঙ্গে তাকালো সে প্রিয়নাথের দিকে। বললে, 'এর জন্যে কষ্ট ক'রে আপনি এসেছেন কেন মালদা থেকে? আমি তো অনায়াসেই চিঠিগুলি পুড়িয়ে ফেলতে পারতুম।'

'তা ঠিক। গাছ যদি ফল না দেয় তবে পাতা কুড়িয়ে রেখে লাভ কী? তবু সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হওয়া ভালো। মানুষের মন কখন কী ধুয়ো ধরে বসে বলা যায় না। প্রিয়নাথ হাসলো কি হাসলো না।

নগেন বাড়ির ভিতরে গিয়ে বাক্স খুলে নিয়ে এল চিঠির বাণ্ডিলটা। ফিতে দিয়ে বাঁধা। তারিখওয়ারি সাজানো। কিশলয় থেকে ফলের উঁকিঝুঁকি। অনেক স্বীকৃতি ও বিকৃতিতে ভরা। শিথিল ও অবসান।

'এই সব?' চিঠির তাড়াটা হাতে ক'রে প্রিয়নাথ জিগ্গেস করলে।

'সমস্ত।'

ক'টা বিশেষ চিহ্ন শিখে এসেছিলো প্রিয়নাথ, তারিখের কিংবা

বস্তুর, মনে-মনে মিলিয়ে দেখলো, প্রবঞ্চিত হয়নি। ঘোরঘটা বা বর্ণচ্ছটা সব ক'টাই ঠিক আছে।

'ধন্যবাদ।' প্রিয়নাথ এবার স্পষ্টরেখায় সময় পেল হাসতে। বললে, 'আপনার ওপর আমাদের অগাধ বিশ্বাস ছিল, নইলে আসতেই পারতুম না। আপনাকে দিয়ে সুশীর কোন অনিষ্ট হবে, অহিত হবে, এটা ভাবাই আমাদের ভুল। তবু প্রতিক্রিয়াটা বৈরাগ্যে আসে না প্রতিহিংসায় আসে কিছু ঠিক নেই। যে যত সম্ভ্রান্ত তার তত ভয় ব্লেকমেইলকে। আমার চাকরি আর সুশীর সম্মান। বুঝতেই তো পাচ্ছেন—একটা বি-সি-এস্-এর স্ত্রী—'

সম্ভ্রান্ত! মালী শুধু মল্লিক হয়নি, সুশীলা হয়েছে সু-শী!

'সত্যি, আপনি কী উদার!' প্রিয়নাথ পিঠটা টান করলো ওঠবার উদ্যোগে।

'আমার চেয়ে আপনি তো বেশি।' নগেন হাসলো একবার শুকনো মুখে: 'সব জেনেশুনে এতখানি বিনয় এতখানি প্রশ্রয়—'

'রেখে দিন মশাই, উচক্কা বয়েসে অমন লক্কামো অনেকেই ক'রে থাকে। আজকেই না হয় আমি মল্লিক হয়েছি, তার আগেই কি দু'-একটি মল্লিকা ফোটেনি আমার মালঞ্চে? ও-সব ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আনতে হয় না। আসলে কি জানেন, মনের একটা সুখ আছে, সে-সুখটা ঘুরে গেলেই ব্যস, আসমান-জমিন ফারাক। যা ছিল না-হলেই-নয়, তাই হ'য়ে দাঁড়ায় কী-হয়-না-হলে!' প্রিয়নাথ শব্দ ক'রে হেসে উঠলো।

'আর এই ওর কলেজের গ্রুপ-ফটোটা। এটাও নিয়ে যান।' নগেন দেয়ালের পেরেকে হাত দিল।

এক মুহূর্ত্ত দ্বিধা করলো প্রিয়নাথ। যেন দয়ার্দ্র গলায় বললে, 'না, ওটা আপনি রাখুন। অনেকের মধ্যে আছে, আলাদা ক'রে চেনা যায় না। ওটা নির্দ্দোষ যেহেতু ওটা নির্ব্বাক।'

সিগারেটের জলন্ত খণ্ডটা মেঝের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে প্রিয়নাথ চলে গেল। নগেন কিছু বললো না, কিছু করলো না, কিছু ঠিক বুঝলোও না হয়তো।

সব চেয়ে আশ্চর্য, শরীরে সে একটা রাগ বা জ্বালা বা লালসা কিছুই টের পেল না। ইচ্ছে করলে, এখনো ইচ্ছে করলে কি সে মালীর মালঞ্চ লুণ্ঠিত-লুষ্ঠিত ক'রে দিতে পারে না? জেলে যাবে? জেলে যেতে সে ভয় করেছে কোনোদিন? তার যে-শাস্তি, যে-পরাভবই হোক, ওদের বাতাসে আনতে পারে না সে ভয়, আকাশে ছায়া? সমস্ত বিশ্রী ও বিশৃঙ্খল ক'রে দিতে পারে না সে ইচ্ছে করলে? সমাজকে কী এমন ভেঙেছে সুশীলা! তার আদিমতম কঠিন শিকড় ধ'রে টান মেরে তাকে এখন উৎপাটিত ক'রে ফেলে দেওয়া যায় না? ফাটল ধরিয়ে দেওয়া যায় না এই মরা মাটিতে?

কিন্তু, আশ্চর্য, শরীরে কোনো স্বাদ নেই, স্পৃহা নেই। সে হিমকাম।

আদালত থেকে পিওন এসে হাজির। কি-এক মুৎফরাক্কা মোকদ্দমায় নোটিশ ধরাতে এসেছে।

"কি, আমাদের বিরুদ্ধে?' নগেন দিশে খুজে পেল না: 'কিসের নালিশ? কে করেছে?'

দরখাস্তের নকল থেকে নাম দেখে পিওন বললে, 'মন্তাজ মল্লিক।'

'আবার মল্লিক? কোথাকার মন্তাজ মল্লিক!'

'শ্রীধরপুরের।'

'সে তো আমাদের খাতক। যার জমি গির্‌বিতে দখল করছি আমরা এই ষোলো বছর। টাকাকড়ি শোধ করেনি, তার আবার নালিশ কিসের? নালিশ একটা ক'রে দিলেই হলো? আমি তা হলে প্রিয় মালীর বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দি এক নম্বর?'

উকিল হারাধন চক্কোত্তী বাবার বন্ধু, নগেন তাঁরই শরণাপন্ন হলো। এই রসিকতার অর্থ কী? কর্জের টাকা ফেরৎ নেই, উলটে মামলা!

ভুঁড়িতে সোনার চেন্‌-ফেলা উকিল এই হারাধন। [illegible] প্রায় হাজার বিঘে, কিন্তু বাড়ীর চেহারাটা কেন-কে-জানে তেমন সরগরম নয় আজকাল। বৈঠকখানায় নেই তেমন মক্কেল, খলেনে চলছে না ঝাড়াই-মাড়াই, সৌভাগ্যলক্ষ্মী যেন একে-একে গায়ের গয়না খুলে ফেলছেন।

হারাধন এক নজরেই জল ক'রে দিলেন। একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'ঠিকই নালিশ হয়েছে। ও-জমি এখন মস্তাজের।'

সুশীলা প্রিয়নাথের এমন কথা শুনেও নগেন এত উদ্বিগ্ন হয়নি। বললে, 'মস্তাজের? একটা ফুটো পয়সাও দিলে না এতদিনে, শুধু ফসল উশুল দিয়ে তামাদি বাঁচানো, এরি মধ্যে জমির দখল তাকে ছেড়ে দিতে হবে?'

'হ্যাঁ, দিতে হবে। এই আইন।' অবার্য শোকে দর্শন আওড়াবার মত ক'রে হারাধন বললেন, 'পনেরো বছরের উপর তোমরা তার জমি ভোগ-দখল করেছ। তাতে তোমাদের কিছু জুটুক বা না-ই জুটুক, ইতিমধ্যে বন্ধকের দেনা সুদে-আসলে সম্পূর্ণ শোধ হয়ে গেছে—এই দাঁড়িয়েছে এখন আইনের চোখে। উপায় নেই। মানতেই হবে আইন।'

'মানতেই হবে?' নগেন অভ্যাসবশে প্রতিবাদ ক'রে উঠলো: 'কিন্তু আমাদের তবে চলবে কি ক'রে?'

'জমিহারা হয়ে মস্তাজের যেমন চলছিলো এতদিন।' হারাধন কাষ্ঠহাসি হাসলেন। বললেন, 'আমার দিকে তাকাচ্ছ কী অত ক'রে? আমিও আজকাল হারা চক্কোত্তী হয়েই ব'সে আছি। আমার হাজার বিঘে এখন আদ্ধেকে এসে দাঁড়িয়েছে। কী করবো বলো? এখন

হচ্ছে চাষার যুগ, প্রজার রাজ্য। ছেড়েই দিতে হবে মাটি, উপায় নেই।'

'ছেড়েই দিতে হবে।' নগেন নিষ্প্রাণের মতো আওড়ালো কথাটা।

'হ্যাঁ, তাই এখন আর খত-তমসুক চলবে না, ঝাড়া খাড়া কবালা।' হারাধন চোখে-মুখে একটা দুঃসহ ভঙ্গি করলেন।

নগেন মেনে নিল, যেন গভীর ক'রেই মেনে নিল, হারাধনের আইনের ব্যাখ্যা কিন্তু তার মা বিনয়িনী মানতে চাইলেন না। বললেন, 'হারা চক্কোত্তী! ও আবার আইনের কী জানে! তুই একবার পবন বিশ্বেসের কাছে গিয়ে খোঁজ নে, জেনে আয় অমন কোনো সৃষ্টিছাড়া আইন হয়েছে কিনা সত্যি! এখনো তো কোম্পানী আছে, না, এটা এখন মগের মুলুক?'

পবন বিশ্বেস উকিলের মুহুরি, মোকদ্দমার ফড়ে। কানে কলম গোঁজা। দাঁত খোঁটবার খড়কে। তার চেয়ে আর কে বেশি বিশ্বসনীয়? কিন্তু সেও নাকি হারাধনের মতেই সায় দিয়েছে। বিনয়িনী রাগে অসহায় বোধ করতে লাগলেন। বললেন, 'এ হতেই পারে না। এ জুলুম, এর মধ্যে ষড়যন্ত্র আছে।'

নগেন শান্তমুখে হাসলো। বললে, 'ন্যায় আছে। যার জমি তারই তো ফিরে পাওয়া উচিত। দখল করছি ব'লে স্বত্ব তো আর আমাদের নয়।'

'কিন্তু আমাদের টাকা? আমাদের টাকা সে শোধ করবে না?'

'শোধের অতিরিক্ত হয়ে গেছে, মা। পনেরো বছরের ওপর তার জমি আমরা শুষেছি, মুঠো-মুঠো লুঠ করেছি তার ফসল। শোধ হয়ে এখন শোষ হয়ে গেছে, মা।'

'সে তো সুদের বদলে।' বিনয়িনীর স্বরে কান্না প্রায় উছলে

উঠলো : 'কিন্তু আমাদের আসল কী হলো? আমাদের আসল তা ব'লে মারা যাবে?'

'অনেক আসলই নকলে মারা যায়, মা। পেতে-পেতে হাতের মুঠ কেবলই দৃঢ় হতে থাকে, ভোগ করাটাই মনে হয় অভ্যাস, অধিকার, ত্যাগ করা নয়। মুঠ খসাবার যে দিন এসেছে মানতে পারিনে।'

ছেলের এই সহানুভূতিহীনতা বিনয়িনীর কাছে অসহ্য মনে হলো, তার স্বরের এই নির্লিপ্তি। পরিবর্তনকে মেনে নেবার এই নিশ্চেষ্ট মনোভাব। হঠাৎ তিনি মুখিয়ে উঠলেন নগেনের উপর: 'খাবি কী, খাওয়াবি কী তবে? সমস্ত সংসার কি তবে উপোস ক'রে মরবে?'

'জানিনা, কিন্তু আরেকজনের সংসারে খাবার ভাবনা আজ ঘুচলো মা। আমি ভাবছি কেমন ক'রে মন্তাজের উপোসী সংসারে আজ হাসি ফুটবে! ধান যাবে তার বাড়িতে আঁটি বেঁধে, গাদি করা হবে খলেনে, ঝাড়াই-মাড়াই হয়ে উঠবে গিয়ে মরাইয়ে। কী আজ তার সুখের দিন ভাবো দেখি। যার যা জিনিস তাকেই তো তা ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। তোমার বিবেক কী বলে, উচিত নয়? মান-প্রতিপত্তি হয়তো ম্লান হবে, কিন্তু নিজের মনের কাছে কতখানি আরাম পাবো বলো তো।'

নগেন নিশ্চয়ই সুস্থ নয় নইলে এতখানি সর্বনাশ কেউ মাথা পেতে মেনে নিতে পারে? বিনয়িনী বললেন, 'কিন্তু এ সংসারে যে নিরীহ কতগুলি ক্ষুধার্ত আছে, তাদের উপায় হবে কী?'

'উপায় একটা হবেই।'

'মন্তাজের জমিতে বর্গা-চাষ তো আর করতে পাবিনে?'

'বোধ হয় না। তবে কারখানায় গিয়ে কুলি হতে পারবো। মৌলিক পদবীটা আস্তে আস্তে মালীতে এসে অস্ত যাবে।'

মা যতই অশান্তি করুন, অভাবের তাড়নায় আর অবস্থার অসহায়তায়,

নগেন দেখতে পারছে এই আইনের মধ্যে সুদূর সদ্বিচারের সম্ভাবনা। হাত-বদলের হাতছানি। সমমূল ও সমমুল্যের প্রতিশ্রুতি।

কিন্তু তার, সত্যি, তার কী ক'রে চলবে? কী ক'রে জ্বলবে এই বিরাট যজ্ঞকুণ্ড?

আছে এখনো আরো বিঘে পাঁচেক শালি জমি, সুলতানগঞ্জের এলাকায়। এটা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত আছে নগেন, কিনে খাস ক'রে রেখে গেছেন বাবা। তবু যদি মুখের অন্নটা শুধু উঠে আসে!

কিন্তু তারপর?

তারপরেও আবার সেই আদালতের পেয়াদা, এসেছে তেমনি সমন ধরাতে।

'তার মানে?' নগেনের পায়ের তলা থেকে মাটি গেল স'রে।

'আপনাদের সুলতানগঞ্জের প্রজা মাতব্বর করাতি নালিশ করেছে আপনাদের নামে, তার জমি ফেরত পাবার জন্যে।'

ভূতাবিষ্টের মতো নগেন তাকিয়ে রইলো। এও আবার হয় নাকি? ও-জমি যে বাবা টাকার ডিক্রীতে নিলেম ক'রে দখল নিয়ে ভাগে বন্দোবস্ত দিয়ে খাঁটি ক'রে রেখে গেছেন। সেও আবার ছিনিয়ে নেয়া যায় নাকি জোর ক'রে? এ অসম্ভব।

গেল সে ফের হারাধন চক্কোত্তীর কাছে। আশ্চর্য, এবারো হারাধন বললেন, আইন মাতব্বরের পক্ষে। সত্যি ক'রে জমি যখন তার তখন শুধু হস্তান্তরের ওজুহাতে তার অধিকারের উচ্ছেদ হয়নি। আই[illegible] স্বীকার করে নিয়েছে ন্যায়কে।

'কিন্তু আমাদের অপরাধটা হয়েছিলো কোথায়? হ্যাণ্ডনোটের টাকা শোধ করতে পারেনি, ডিক্রি ক'রে নিলেম করে নিয়েছি। সেও তো এই আইনেরি জোরে। নয়?'

'কিন্তু হ্যাণ্ড-নোটের সুদটা নিশ্চয়ই জেয়াদা ছিল।'

'টাকায় মাসে দু'পয়সা ক'রে। সে এমন বেশি কী। তখন অমন কড়াক্কড়ি ছিল কই? কত জায়গায় সুদ চক্রবৃদ্ধিহারে বেড়ে গেছে। বারো হাত কাঁকুড়ের বাষট্টি হাত বিচির মতো।'

'সেইটেই ছিল অপরাধ। সোনার ডিম পাড়ে যে হাঁস, সোনার লোভে তার পেট কেটেছি আমরা, এখন তার পেটে হাঁসের ডিমও জন্মাচ্ছে না, বাবাজী।' হারাধন হাসলেন ভবিতব্যতার কথা ভেবে: 'আমার দিকে তাকিয়ে দেখ, আমাকেও এমনি অনেক ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে। কী আর করা—সোনাটা বড় করেছিলুম ব'লেই এখন সব লোনা ঠেকছে। সব উলটে যাচ্ছে আর কী। উপায় নেই, আইনেও শুরু হয়েছে এখন দিন-বদলের দিন। তাই, এখন যা হবে, জেনে রেখো শুধু থাড়া কবালা।' হঠাৎ আবার একটা নির্দয় ভঙ্গী তাঁর যুক্ত ঠোঁটের উপর বেঁকে বসলো।

'কিন্তু তাই ব'লে আগের আইন, আগের অধিকার সব বাতিল হয়ে যাবে?'

'কে কখন আইন করে তার উপরেই নির্ভর করে, বাবাজী। আগে ধরো, রায়তদের দান-বিক্রির অধিকার ছিল না, এখন একেবারে নির্বাধ আধিপত্য। আইন মানুষেই করে, মানুষেই ভাঙে। যার হাতে যখন শক্তি তার হাতেই তখন শাসন। এ তো জানা কথা। এখন একলাটি আছ একরকম ধারায় চলছ, কিন্তু যখন বিয়ে করবে দেখবে কত প্রকরণ জুটেছে।'

'কিন্তু আমাদের টাকার কী হবে? ও-টাকা তো আর ফসল খেয়ে শোধ হয়নি। ও ফেরত পাওয়া যাবে না?'

'যাবে যে সেইটেই দয়া। না দিলেই বা কী করতে পারতে তুমি?'

'কবে পাওয়া যাবে?'

'বিশ বছরের কিস্তিতে।'

'বিশ বছর!'

'এটুকু যে দিচ্ছে এতেই তোমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। হিসেব ক'রে দেখ তো সুদের কত বড় স্তূপ জ'মে তুলেছিলে! একদম কিছু না,— দেওয়ার বিধানটাই সঙ্গত, আর কেউ এ বলতে পারতো অনায়াসে।'

'ততদিন, কিস্তি শোধ না হওয়া পর্যন্ত, জমি খাবে কে?'

'যার জমি সে। মাস্তবর করাত্তি।'

'আর আমাদের কী হবে?'

হারাধন চক্কোত্তী মৃত চোখে হাসলেন। বললেন, 'সামনের দেয়ালকে জিগ্‌গ্যেস কর।'

এবারও মেনে নিতে চাইলে না বিনয়িনী। বললে, 'আইনের জানে কী ও? ও তো আর পরীক্ষা-পাশ-করা উকিল নয়। ব'লে দিলে একটা বাজে কথা। পরের পাকা ধানে মই দেয়া দেখতে সুখ কত ওর! তুই যা, পবন বিশ্বেসকে ডেকে নিয়ে আয় আমার কাছে। আমি একবার সব বুঝে নেব তার থেকে, ধর্ম এখনো দাঁড়িয়ে আছে না কী!'

'হারাধন চক্কোত্তী মিথ্যে বলবে কেন? সেও তো আমাদেরি দলে। আমাদেরি মতন ভুক্তভোগী। তারো অমনি ফেরত গেছে অনেক জমিজিরাৎ।' নগেন যেন কিছুটা আশ্বাস পেল।

'তার তুই জানিস কী, হতভাগা? জমির তো সে ভাগি তোয়াক্কা রাখে! তার তেজারতি কত? ব্যবসার তেজারতি। নগদ টাকার গণ্ডার সে একটা। কোলকাতায় কাশীতে তার বাড়ি আছে ক'খানা। মাসে ভাড়া আসে পাঁচশোর উপর। শেয়ারের মুনফা থেকে গিন্নির গয়না হয় বছর-বছর। তাকে তুই কিনা দলে পেয়েছিস ব'লে খুশি হচ্ছিস!'

'কিছুই বলা যায় না মা, হারাধনও একদিন দলে পুরো ভিড়ে যেতে

পারে। ওর পাওয়াটাও আইনের চোখে খুব ন্যায়সঙ্গত বলে মনে না-ও হতে পারে একদিন। যা আজ ও ছাড়ছে না তাও একদিন ফেরত হ'য়ে যেতে পারে, মা। ও আজ বড্ড খাড়া কবালার স্বপ্ন দেখছে, কিন্তু কে জানে, এই কবালায়ও হয়তো আসবে না কোনো মাটির অধিকারে, ঘরপোড়ার কাঠও হয়তো তার জুটবে না একখানা। আইন আবার বদলে যেতে কতক্ষণ?'

বিনয়িনী ঝংকার নিয়ে উঠলেন: 'সবই ফেরত হচ্ছে, কিন্তু আমাদের —আমাদের জিনিস ফেরত দেয় কে? উনি আবার তবে ফিরে আসুন, নদীতে আমাদের দেশের যে সব বাড়ি-ঘর জমি-জমা খোয়া গিয়েছিলো তার এবার ক্ষতিপূরণ হোক! আমরাই কেবল একধার থেকে ফেরত দেব, আর আমদেরটা ফেরত দেবার কেউ নামও করবে না। এই তোর আইন—এই আইন ঈশ্বরের?' বিনয়িনী দেয়ালে মাথা ঠুকতে লাগলেন। বধির ঈশ্বরের উদ্দেশে।

কিন্তু দিগদিগন্তব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে ঈশ্বরকে কোথাও দেখা গেল না। এই বুঝি চৈত্রের অন্ধকার। বাতাস স্তব্ধ, জল স্থির। কিন্তু একটা তুফান উঠলে যেন শ্বাস ফেলা যেত। মনে হলো নগেনের। হয়তো ডোববার আগে দেখতে পেত হারাধন চক্কোত্তীও ডুবছে।

মার কথাটা তীব্র চীৎকারের মতো কশাঘাত ক'রে উঠলো সেই অন্ধকারে: কিন্তু আমাদের জিনিস কে ফেরত দেয়?

নগেন মূঢ়ের মতো তাকালো একবার দেয়ালের দিকে। যেখানে সুশীলার ফটো আর ভারতবর্ষের মানচিত্র।

চাল

চালের গুদামের যিনি চার্জে ছিলেন, তাঁর বদলির হুকুম এল হঠাৎ। জরুরি হুকুম, টেলিগ্রামে। এক্ষুনি যেতে হবে, এই অবস্থায়। যেতে হবে বর্মায় না আফ্রিকায় বা আর কোনো দিগন্তরে। বলা বারণ।

নীচেকার লোক হচ্ছে পরিতোষ সরকার। পাকা চাকরির লোক। অন্য জায়গায় তলাকার কুঠুরিতে কাজ করত, সেখানে 'লিয়েন' রেখে এ-চাকরিতে ঢুকেছে। একটু বেশি টাকার স্বাদ পাবার জন্যে। কে না চায়! কে না চায় জীবনে উন্নতি করতে? আর, জীবনে উন্নতি করার মানেই হচ্ছে অঙ্কের পিঠে শুধু শুন্য বাড়ানো।

পশ্চিমী না দক্ষিণী বোঝা যায় না। বুঝে দরকারও নেই।

নির্ভীক, বলিষ্ঠ, ত্বরান্বিত।

বললে, 'চার্জসিট নিয়ে এস।'

পরিতোষ কাঁচুমাচু মুখে বললে, 'তার আগে ষ্টকটা মিলিয়ে নিলে হত।'

অত সময় নেই। গুমটি-ঘরে বসে চুপচাপ পাহারা দেবার কাজ নয় তার। তার কাজ আরো অনেক বেশি জরুরি। আগে মাঠ না রক্ষা পেলে ধান ফলবে কি করে?

হিসাবকিতাব বুঝসমুঝ করে যোগ-বিয়োগের পর ঠিকঠাক চার্জ নিতে গেলে অন্ততঃ তিন দিন। এক মুহূর্ত দেরি করবার তার সময় নেই।

'যা হয় লিখে নিয়ে এস। আমি সই করে দেব।'

পরিতোষ ফাঁপরে পড়ল। বললে, 'কত বস্তা—ক মণ—'

'যা আছে তাই ঠিক লিখে নিয়ে আসবে।' প্রায় ধমকের মত শোনাল: 'এতে ভাববার কী আছে?'

পরিতোষ আপিসে এল। খাতা খুলে দেখলে, হাতে আছে কত। ঝড়তিপড়তি বাদ দিয়ে কত থাকবার কথা।

'এ তো এক ফ্যাসাদ হল।' হেডক্লার্ককে ডাকাল পরিতোষ। বললে, 'বলছে স্টক ভেরিফাই করবে না। অত সব গোনা-গাঁথার সময় নেই। বলছে, বসিয়ে নিয়ে এস ফিগার, সই করে দি। শেষকালে কি—'

হেডক্লার্ক রাখাল দাস। যাকে বলে, বেঁটে খেঁটে গুরগুটে। চশমার সাঁকোটা ঠিক নাকের ডগার উপর এসে বসেছে। তাকায় চশমার রেলিঙ টপকে।

চশমার রেলিঙ টপকে রাখাল দাস অনেকক্ষণ শ্যেনদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

বললে, 'তা আপনি ঘাবড়াচ্ছেন কেন?'

কথার সুরে চমকে উঠল পরিতোষ। তাকাল রাখালের দিকে। দু'জনের ক্ষুদ্র ও তীক্ষ্ণ একটা চোখোচোখি হল। পরস্পরের মনের কথা জ্বলে উঠল মুহূর্তে।

রাখাল এগিয়ে এল পরিতোষের কানের কাছে বললে, 'এই তো সুযোগ।'

এই তো সুযোগ! পরিতোষের বুকের ভিতরটা দুরদুর করতে লাগল।

এমনি একটা সুযোগের জন্যে দৈবের কাছে প্রার্থনা করেছে পরিতোষ। যাতে এক দিনে, এক ঘুমের পর, চক্ষের এক পলকে সে বড়লোক হয়ে যেতে পারে। এমনি কত লোক হয়ে গেছে রাতারাতি। সংগ্রাম করেনি, সাধনা করেনি, শুধু সুযোগ মিলে গিয়েছে। আচমকা আকাশফুটো। ছিল আঙুল হয়েছে কলাগাছ। ট্যাক থেকে চলে এসেছে গেঁজেতে। ছিল তলাফুটো, হয়েছে আস্তিল।

সেই সুযোগ এসেছে পরিতোষের। সাতপুরুষেও যা আসে না।

চুরি কর'ছ? কে না করছে জিগ্‌গেস করি? ঠকাচ্ছে? কে

না ঠকাচ্ছে এই ঠকের বাজারে? যে পারছে সেই হাতাচ্ছে। অন্ততঃ হাতড়াচ্ছে হাতাবার জন্যে। যার যেটুকু এলাকা, যেটুকু সরহদ্দ। যে চোর নয় সে বেচারা চোর বলে সাব্যস্ত হচ্ছে। গাধার ছাপ পড়ছে তার পিঠের উপর। টাকা হলেই টেক্কা, সাহেব-গোলাম সব পিছে-পিছে। বাপ-মা আত্মীয়স্বজন সবাই বলবে মানুষ হয়েছে ছেলেটা। সমাজ বলবে উপযুক্ত লোক, ডাকবে সভাপতিত্ব করতে।

যে বলছে, চুরি করছ, সে কী? যে বলছে, ঠকাচ্ছ, এইটেই কি তার ঠকাবার মতলব নয়? হয়ত চুরি করতে পারছে না বলেই তার রাগ আর তম্বি। সে কেন ঠকাতে পারল না তাই তার ঈর্ষা আর অভিশাপ।

পরিতোষ জামার হাতায় কপালের ঘাম মুছল। কোঁচা দিয়ে মুছল গলার ঘাম। আধগ্লাশ জল খেল। বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল ও মধ্যমা দিয়ে টিপে ধরল কপালের রগদুটো। প্রথমটা ব্যথা-ব্যথা লাগল। কিন্তু, না, ছেড়ে গেছে।

না, ধরা পড়বে না। কি করে ধরা পড়বে? দেখ চার্জসিট।

রাখাল দাস চোখ মটকাল আরেকবার।

কত লোক মরে গেছে এক মুঠো ভাতের অভাবে। দু-একটা তেমনি মৃত্যু পরিতোষ দেখেছে তার চোখের উপর। বুকটা ফেটে গেছে। তখন যদি সাধ্য থাকত, সে খাওয়াত তাদেরকে। খাওয়াতে হলে অনেক উদ্বৃত্ত চাই। বাড়তি মুনফা না পেলে সে লঙরখানা খুলবে কি করে? অঢেল না থাকলে করবে কি করে খয়রাতি?

কেউ নিচ্ছে ঘুষে, কেউ নিচ্ছে শুষে, কেউ নিচ্ছে হাত পেতে, কেউ কান মলে। কেউ খেয়ে, কেউ ছাঁদা বেঁধে। ডাইনে না পেলে বাঁয়ে। ভেড়ার গোয়ালে তাকে ঘোড়া হতে বলার মানে নেই। আমাকে ধরতে এসেছ? কিন্তু উনি? তিনি? তুমি নিজে?

চার্জসিটে পাঁচ শো বস্তা কম দেখাল পরিতোষ। সরল বিশ্বাসে ম্যানেজার তাতে সই করে দিলেন।

পাঁচ শো বস্তা, প্রায় দেড় হাজার মণ। চলতি দাম কত চালের? একটা বিরাট অঙ্ক করতে গেল পরিতোষ। মাথাটা ঝি-ঝি করতে লাগল।

'আর চাকরি করবার দরকার হবে না।' বললে রাখালদাস।

'কিন্তু চাকরি ছেড়ে দেয়া যাবে কি তাই বলে?'

'না, না, পাগল! চাকরি ছেড়ে দিলেই তো লোকে বলাবলি শুরু করবে, লোকটার চলে কিসে? হাল-চালও একটুও বাড়ানো চলবে না। রাখতে হবে সমান দৈন্যদশা। উঠানভরা জঙ্গল, ছেঁড়াখোঁড়া কাপড়-জামা, হাতল-ভাঙা চায়ের কাপ। আর সাত দিনে এক দিন দাড়ি কামানো।'

বখরা ঠিক হয়ে গেল। দশ আনা ছ' আনা।

এখনো সব কাগজে-কলমে। হাতে-হেতেরে হওয়া দরকার। দরকার চালকে টাকায় নিয়ে যাওয়া।

ভাবনা নেই, এই আসচে শুক্কুরবারই আসবে চালের বেপারীরা। ভাউলের চেয়েও বড় নৌকো। বলে, পশ্চিমী না। কাছি-গলুই, ছত্রি-গলুই সবই যার জাঁদরেল।

শুক্কুরবার নৌকো নিয়ে এল বেপারীরা।

সর্দার-মাঝিকে আড়ালে ডেকে নিয়ে রাখালদাস কথা পাড়লে। 'একবারে এত মাল এক সঙ্গে সরানো যাবে না। আস্তে-আস্তে, দফায় দফায়, কিস্তিতে কিস্তিতে নিতে হবে। কি, রাজি?'

'ভয় করে বাবু।'

'ভয় কিসের? তেরপল আছে ঢাকা থাকবে। আসল যা বরাদ্দ মাল, তার পরিমাণ পারমিটে যেমন লেখা থাকে, লেখা থাকবে তেমনি।

যারা পথ আটকাবার, তারা পারমিট দেখেই ছেড়ে দেবে বেমালুম। কাঁটা নেই যে ওজন নেবে রাস্তায়। বস্তা ধরে যে গুণবে তার মজুরি দেবে কে? সিধে চলে যাবে আড়তে, তাদের গঞ্জ-গোলায়। খিড়কির দরজাতেই কালোবাজার বসবে। খালের মুখে ভিড়বে আবার হাটুরে নৌকা। মোটা দরে কিনে নেবে দালালেরা।'

না, ভয়ের কোনোই কারণ নেই। কোমল ও মসৃণ তাদের রাস্তা।

'কিন্তু,' সর্দার-মাঝি গলা নামিয়ে বললে, 'টাকা নিয়ে আসিনি যে সঙ্গে করে।'

গরম-গরম নগদ টাকা ছাড়া চলতে পারে না এ কারবার। এ হচ্ছে বাঁ হাত ডান হাত। ফেল কড়ি, মাখ তেল।

দু' হপ্তা পর আরেক শুক্কুরবার যখন মাঝিরা আসবে, তখন নিয়ে আসবে নোটের কেতা। প্রথম কিস্তি।

বেকড়ার দিনে মাল নেবার হুকুম নেই। রিভার-পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যাবে। পারমিটের আড়ালে তেরপলের নীচে রসিদের রক্ষাকবচ এঁটে ব্যূহভেদ করে বেরিয়ে যাওয়াই নিরাপদ।

পরিতোষের সেই শুক্কুরবার আর আসে না। শুয়ে শুয়ে সে স্বপ্ন দেখে। চাল চলে যাচ্ছে টাকায়। টাকা চলে যাচ্ছে ইটে, মোটরের টায়ারে। তার নেড়াবোঁচা স্ত্রী চলে যাচ্ছে পটের বিবিতে।

কিন্তু শুক্কুরবারের আগেই, বলা-কওয়া নেই, পরিতোষের বদলির হুকুম এসে হাজির হল। পত্রপাঠ রওনা হতে হবে। বিনামেঘে বজ্রপাত বইতেই পড়েছিল এত দিন। আজ পড়ল তার মাথার উপর।

সম্প্রতি রাখালদাসকে চার্জ দিয়ে যেতে হবে। পরে লোক আসছে ঠিকঠাক। শোনা যাচ্ছে কে এক কৃষ্ণলাল মালাকর। পাকা-গাঁথনির চাকরি নয়। না হোক, কিন্তু পাকা আম এবার দাঁড়কাকে খাবে।

'একে পাড়ে অন্যে খায়। দুনিয়ার নিয়মই এই।' পরিতোষ

বললে, 'কিছু ভাগ দিও রাখাল। কাজ ফুরুলেই একেবারে পাজি করে দিও না।'

উপায় নেই, আগের হিসেবের বনিয়াদেই নতুন চার্জসিট হয়েছে। ফরাকৎ হয়ে গেছে পরিতোষ। আর তার দাবি-দাওয়া নেই কাণা-কড়ির। তাই বললে রাখালদাস, 'কিন্তু যদি আসামী চালান হই, তখন কি কাঠগড়ায় পাশে এসে দাঁড়াবেন?'

কৃষ্ণলালের বয়েস কম। নতুন চাকরি। নতুন আশা। দৃষ্টিতে নতুন দিকদেশ। নতুন প্রভাতের আভাতি।

দু' দিন পরেই শুকুরবার। মাঝিরা থাক-থাক নোট নিয়ে আসবে কাপড়ের পরলে।

গুমী মামলায় কৃষ্ণলালকে সামিল করে নিতে হয়! সরা সরিয়ে হাঁড়ির মুখটা খুলতে হয় আস্তে-আস্তে! কৃষ্ণলালকে ছাড়া কিছুই হবে না। হিসাব-নিকাশের মালিক সে, খাতাপত্রের সেই জিম্মাদার।

বেকার বসে ছিল, দেখতে-দেখতে কপালের পাথর পাতা হয়ে উড়ে গেল। ধুলোমুঠ সোনামুঠ হল। একেই বলে অদৃষ্টের খেলা। ভাগ্যের ভোজবাজি।

কানের কাছে মুখ আনল রাখালদাস। বললে ফিসফিসিয়ে। একটি আঁচড়ও কাটতে হবে না কোথাও, যোগসাজসের চিহ্ন নেই এতটুকু। পরিতোষের চেয়েও তার চেহারা অনেক পরিচ্ছন্ন। সে নতুন এসেছে, আগের হিসাবের সে জানে কি? খাতায় যা আছে তাই সে দেখে নিয়েছে। হিসাবের বাইরে বাড়তি কোনো মাল থাকতে পারে না, থাকলেও তার জানবার কথা নয়। এমনি তার পালাবার পথ আছে পরিষ্কার।

ফল তারা আগেই পাকিয়ে রেখেছে। বোঁটা পর্যন্ত তাকে ছিঁড়তে হবে না। শুধু তলা থেকে তুলে নিয়ে আসা।

সেই বাড়তি মালটা এখন নৌকো বোঝাই করে নিয়ে যাবে বেপারীরা। বিনিময়ে ক' বাণ্ডিল নোট চলে আসবে কৃষ্ণলালের হাতে। ডান হাতও জানতে পারবে না কী নিল সে বাঁ হাতে।

এই সেই চাল! কৃষ্ণলাল ভাবল মনে-মনে। যে চালের জন্যে লোক দোরে-দোরে ঘুরে-ঘুরে ধুঁকে ধুঁকে মরেছে। অন্যায় করেনি, হল্লে হয়নি, শুধু কেঁদে কেঁদে মরেছে। সেই চাল সে সরিয়ে দেবে; তার নিজের লোভের হাঁ বোজাবার জন্যে ঠেলে দেবে আরেক লোভের হাঁ-এ। আর, তার ফলে কটা ক্ষুধিত মানুষের অন্নের গ্রাস ছোট হয়ে যাবে, পেট ভরবে না পুরোপুরি। চড়া দরে চাল কিনতে গিয়ে কাপড় কিনতে পারবে না, কিনতে পারবে না ব্যামোপীড়ার ওষুধ। সন্ধ্যেবেলায় জ্বলবে না আর কেরোসিনের টেমি। মার বুকের দুধ যাবে শুকিয়ে।

আজকে প্রথম নিজের লোভের অবসান ঘটিয়ে সেই লোভহীন শুভদিনের সে পত্তন করুক। সে না হলে সেই নতুন প্রভাতের অবতারণা করবে কে? একজনকে তো প্রথমে ত্যাগ করতে হবে। একজনকে তো দেখাতে হবে পথ। অন্ততঃ একজনকে তো শুচি হতে হতে হবে সেই মৃত্যুর অগ্নিস্নানে।

'একটু ভেবে দেখুন।' রাখালদাস তাকাল চশমার রেলিঙ টপকে।

'ভেবে দেখেছি। অফিসরকে আমি টেলিগ্রাম করছি এখুনি।'

তার পেয়ে চলে এলেন অফিসর। ফুলো হাতে কৃষ্ণলালের পিঠে তারিফের চাপড় দিলেন। বাড়তি মাল বাইরে না রেখে নিয়ে এলেন হিসেবের আমলে।

রাখালদাসের সঙ্গে তাঁর একটা ক্ষুদ্র ও তীক্ষ্ণ চোখোচোখি হল। হল বা একটু প্রচ্ছন্ন চোখ টেপাটিপি। যার অর্থ হল এই, এমন মহান্ মূর্খও আছে আজকের পৃথিবীতে। এমন নীরেট

এল সেই নতুন প্রভাতের ভূমিকা। যুদ্ধ শেষ হল। কৃষ্ণলালের সাময়িক চাকরি, ছাঁট হয়ে গেল। শূন্য হাতে পথে নেমে এল কৃষ্ণলাল।

ভাবল, কোথায় এক মুঠো চাল জুটবে! তার চাল চলেছে কোন্ বেপারীর নৌকায়!

আঙ্গিক

আগের বার কি হয়েছিলো, জলধি একবার চেষ্টা করলো ভাবতে। খুব ঝাপসা, একরত্তা, মনে পড়ে কি পড়ে না। আলগোছে প্রথমে হাত ধরেছিলো বোধহয়, একটি আঙুল, গোলালো মণিবন্ধ, হয়তো বা চুড়ির বেড়া ডিঙিয়ে দুর্বল করতল। কিছুই বলতে হয়নি। সামান্য একটু টেনেছিলো হয়তো কাছে, তাতে না ছিল জোর, না বা মিনতি। নদীর এক পার যেমন আরেক পারকে ডাকে। কি থেকে কী হয়ে গেল কে বলবে, দিকদিগন্ত অন্ধকার করে উথলে উঠলো বন্যার শুভ্রতা।

কিসে আর কিসে! মনে-মনে হাসলো জলধি। সে বা কে, আর এ বা কে! সে ছিল পাশে শুয়ে, নির্জীব, নিশ্চিন্ত; আর এ সামনে দাঁড়িয়ে, জ্বলছে অথচ কাঁপছে না। সে ছিল বউ, আর এ ছাত্রী। জলধির বুকের ভিতরটা ধ্বক ক'রে উঠলো। তবু, কে জানে, একই সম্মতি একই প্রতীক্ষা দিয়েই তারা তৈরি। একজন বৃত্ত থেকে বিন্দুতে, আরেকজন বিন্দু থেকে বৃত্তে। একজন নিক্রান্ত, আরেকজন অনতিক্রম্য।

জলধি জানতো, একটা ঘুর-পথ আছে স্তব-স্তুতির পথ। উপহার-উপকরণের পথ। বিষাদ-অবসাদের পথ। জলধি তা ভাবতেও পারে না। কথার যে অর্ধেক মুখে ফুটবে না তা চোখে ফোটাতে হবে এ দুঃসাধনা জলধির নয়। সে ডাক্তার। সে দ্রুত, সে নৃশংস। ঘায়ে যেখানে ছুরি চালাতে হবে সেখানে অকারণে পুঁজ জমতে দিতে সে রাজি নয়। যা করবার, তা এক্ষুনি-এক্ষুনি করবার। সমস্ত জিনিসটা দেখছে সে চিকিৎসার চোখে। সন্ধিৎসার চোখে নয়। আর, যেটা নিতান্তই স্নায়ু, সেখানে বীণার তারের সন্ধানটা নিতান্তই বিড়ম্বনা।

আরেকটা যা রাস্তা আছে তা নিতান্তই জঘন্য। ভাবতেও ঘেন্না ধরে। সে হচ্ছে ওর বাপের কাছে সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব করে পাঠানো। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে যাওয়া। ওর বাবা নিশ্চয়ই

ওর মত জানতে চাইবেন, আর ও তৎক্ষণাৎ, নিশ্বাসের অর্ধপথেই, মামলা খারিজ করে দেবে। কে বা না দেয়, যার আত্মসম্মান থাকে! নিমেষে ফুটো বেলুনের মতো চুপসে যাবে জলধি। মুখ দেখাতে পারলেও মুখ আর দেখতে পাবে না। বাবা যদি যুক্তি চান, অনেক কিছুই দেখাতে পারবে সে ইচ্ছে করলে, বানাতে পারবে অন্তত। প্রথমেই বলবে, দোজবরে, বুড়ো, কুড়ি-একুশ বছরের মেয়ের কাছে প্রায়-চল্লিশ বছরের পুরুষ বুড়ো বৈকি, সর্বশেষে বলবে, স্বভাব-চরিত্র লোকে ভালো বলে না। যে ডাক্তার অবিবাহিত বা দীর্ঘকাল স্ত্রীহীন তার স্বভাবের কে কবে সুখ্যাতি করে? শত ছানি করেও মামলা আর বাঁচানো যাবে না। ভাবতেও পারে না জলধি সেই অপমানের চেহারাটা। হাজার হোক, সে তো পুরুষ, অদৈবনির্ভর।

সুতরাং পুরুষের মতোই সে ব্যবহার করবে। মুগ্ধ করতে না পারে অভিভূত করবে। তাকে সে ঘুম পাড়িয়ে রাখবে না, জাগিয়ে দেবে, জানিয়ে দেবে। তাকে সময় নিতে দেবে না। ভাবতে দেবে না তাকে সে কবিতার মিল বা স্বপ্নের প্রচ্ছায়া। এক বস্ত্রে সে বেরিয়ে আসবে ঝড়ের মধ্যে। একমাত্র নিয়তিনির্ণীত হয়ে। অনিবার্য রক্তের আহ্বানে।

পরিণামের কথাও ভাবতে চেষ্টা করেছে জলধি। কিন্তু যেটুকু স্পষ্ট তার বাইরে চোখ ফেলবার দরকার মনে করেনি। যদি পায় তো মুঠো ভরে আকাশ পাবে আর যদি না পায় তো একটি দাঁতের গোড়ায়ও তার ব্যথা হবে না। সব রুগীই আর বাঁচে না এক ওষুধে— আর যে মরে, সে মরে; তাতে ডাক্তারের কী যায়-আসে!

জলধি তাই ঠিক করে ফেলেছে। কিন্তু কবে, কখন, কোনখানে!

নামটি যেমন ছোট, তেমনি নরম। কিন্তু চেহারায় তা গরহাজির। বড্ড টান-টান চেহারা। ভুরু, নাক, চিবুক, সব যেন স্পষ্ট রেখায় উচ্চারিত। গা বেয়ে যত রেখা নেমে গেছে পিঠ দিয়ে বা বুকের পাশ দিয়ে, সব যেন তুলির একটানে আঁকা, যেমনি তীক্ষ্ণ, তেমনি মিহি। মনে হয়, এমন যখন সঙ্গত-অবয়ব, তখন নিশ্চয়ই একটা পাথুরে কাঠিন্য আছে কোথাও। থাক, থাক সে কঠিন। কঠিন না হলে সইতে পারবে না, পারবে না আশ্রয় দিতে।

'মৃদু!' স্খলিত জিভে ডেকে ফেলেছিলো জলধি। 'মিস সেন!'

'মন্দ কি। মৃদুই ডাকুন না আমাকে।' মৃদুরেখায় একটু হেসেও ছিলো হয়তো।

এরো চেয়ে আরো সামান্য লক্ষণ থেকে রোগ নির্ণয় করা যায়, তবু জলধি অসহিষ্ণু হয়নি।

'দেখুন তো আমার চোখে কী পড়েছে!'

'কিছুই না। শুধু লাল হয়েছে শুধু।'

'লালই বা হবে কেন?'

'রাত জেগেছিলে বোধহয়।'

'শুধু শুধু রাত জাগতে যাব কেন? শুধু শুধু রাত জাগবার মতো আমার লোক কই?'

'কেন, পড়ে রাত জাগা যায় না?'

'বা, পড়তে যাবো কোন দুঃখে? আপনিই তো আছেন।'

সেটা সময় ছিল বটে, কিন্তু স্থান ছিল না। অনেক সময়, সময় ও স্থান দুইই থাকে, সাহস থাকে না।

'দেখুন, আমাকে একলা-একলা ডাকবেন না আপনার বাড়িতে।'

'বা, তুমিই তো বললে কী নাকি বুঝতে পারোনি।'

'তা পারিনি। কিন্তু বাড়িতে যখন ডাকলেন তখন সংগে হষ্টেলের আর কাউকেও ডাকলে পারতেন।'

'কেন, তারা তো চায়নি বুঝতে।'

'কিন্তু তারা এখন অন্য জিনিস বোঝাতে চায়।'

'তাদেরকে তোমার ভয়?'

'ভয় করলে আসবো কেন?'

'তবে ভয় কী আমাকে?' একলাফে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিলো জলধি।

'তা একটু হয় বৈকি।'

'আমাকে? আমি কী করলাম!' জলধি অনেকটা আবার পিছিয়ে গেল অজানতে।

'আপনার বাড়িতে কোনো স্ত্রীলোক নেই, আমাদের একা আসাটা কি ভালো দেখায়?'

'বা, স্ত্রীলোক নেই তো আমি কী করবো? এক স্ত্রীলোক থাকলে একাধিক স্ত্রীলোক আসবে, আর আমি একা থাকলে একটি স্ত্রীলোকও আসবে না, এই নিয়ম তুমি সমর্থন করো?' লক্ষ্যের প্রায় কান ঘেঁসে গিয়েছিলো কথাটা।

'করি না। তাই তো এলাম।'

এতক্ষণ মৃদু দাঁড়িয়ে ছিল, এবার বসলো চেয়ারে। জলধি আর উঠে দাঁড়াবার সময় পেল না। ছন্দ কেমন ঢিলে হয়ে গেল। বাসাটা অত্যন্ত ভদ্র, আবদ্ধ। অত্যন্ত অলস অকর্মক।

মনের বৈমুখ্য, সাহসের অভাব। জলধি নিয়ে নিয়েছে নিজের ওজন, বুঝে নিয়েছে নিজের বিস্তার। নিজেকেই সে চমকে দেবে ঠিক করেছে। সময় আর সে বয়ে যেতে দেবে না।

স্থান হাসপাতাল, উত্তরের নির্জন বারান্দা, সময় বৃহস্পতিবার রাত

দশটা থেকে বারোটা, দরকার হলে তারো পরে, আরো গভীরে। চারদিকে রোগ, ক্লান্তি, অনিদ্রা, যন্ত্রণা, মৃত্যুর প্রতীক্ষা, মৃত্যুর অস্বীকার। এই বিকল, বিকৃত পরিপার্শ্বে।

একটা কঠিন অথচ অদ্ভুত কেস এসেছে। রোগের চেয়ে রুগিনীর ইতিহাসটাই বেশি মজার। মৃদুকে যথেষ্ট কৌতূহলী করা হয়েছে। আর এমন কি জিনিস তাতে আছে যা না দেখালে মৃদুর শিক্ষাটা সংপূর্ণ হবে না। তা ছাড়া আজ মৃদুর নাইট-ডিউটি, রাত্রিচর্যা। তাকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়া যেতে পারবে অনায়াসে।

নতুন কেসটা সংবন্ধে মৃদুস্বরে বক্তৃতা দিতে-দিতে এবং এটাই সর্বোপরি বোঝাতে-বোঝাতে যে মানুষের সমস্ত রকম পাপই একমাত্র ডাক্তারের কাছে সহানুভূতির যোগ্য, তারা চলে আসবে উত্তরের চোরা বারান্দায়, সর্ট-কাট করবার ওজুহাতে। আলো নেই, না থাক, অন্ধকারেরও একটা আলো আছে। এবং সে-পথ দিয়ে যেতে-যেতে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গিয়ে সে ব্যক্ত করবে নিজেকে, প্রতিপন্ন করবে। মৃদু চিন্তা করতে পারবে না, প্রশ্ন করতে পারবে না, ভাববে, কালপ্রেরিত মুহূর্ত। মৃত্যুর আগে জীবনে যা আর একবার শুধু আসে।

সব মিলে গিয়েছে অবিকল, অন্ধকার আর স্তব্ধতা, পটভূমিকার প্রতিক্রিয়া ও সম্মুখীন একটা অনিশ্চিত আতংক।

কিন্তু হঠাৎ ও অমন কুৎসিত কণ্ঠে চীৎকার ক'রে উঠলো কেন? আনত চক্ষে দেখতে পেল জলধি, ওর মুঠোর মধ্যে ছোট্ট জলন্ত একটা টর্চ। ঠিক এখন তার মুখের উপর বিচ্ছুরিত! সে-আলোয় নিজের মুখটাই নিজের কাছে কেমন অচেনা, অদ্ভুত লাগলো।

'ব্রুট, স্কাউণ্ড্রেল।' টর্চের মুখটা দিয়ে মৃদু জলধির মুখের উপর ঘা মারলে।

এ সমস্তই জলধি বুঝতে পারে, কিন্তু ঐ মুখ, কদাকার চীৎকার

কেন? বড় জোর একটা অস্ফুট আর্তনাদ বা ক্রুদ্ধ ভৎর্সনা, যার জন্ম ভয়ে বা অভ্যাসে; বড় জোর একটা মারমুখী বাধা, যার জন্ম ক্ষণজাত ক্ষিপ্র হঠকারিতায়—এটুকু সহজেই আন্দাজ করতে পারতো জলধি, যদিও বিশুদ্ধ বশ্যতা ছাড়া আর কিছু সে দেখতে পায়নি তার চোখের সামনে। তবু যতই সে বাম থাক, জলধির বাহুও আর বামনের বাহু হয়ে থাকতো না, প্রতিবলকে সে শুধু পারুষ্যের প্রাবল্যেই পরাভূত করতো। কিন্তু এ কী অবিধি! একেবারে গলা ছেড়ে চীৎকার! যেন এ জায়গাটা গ্রামাঞ্চলের গহন পাটক্ষেত।

চীৎকারটা রুগ্ন কণ্ঠের যন্ত্রণার ভাষা নয়, না বা অনিদ্রাপীড়িত আতঙ্কগ্রস্তের নালিশ—এ একেবারে সত্যিসত্যিই যা তাই, একেবারে উদ্‌ঘাটিত। দ্বিতীয় অর্থ কেউ বুঝতে পারে তার অবকাশ রাখেনি কোথাও। বড় জোর একটা চোর গলার হার ধরে টান মেরেছিলো! বা, আঁচল ধরে।

স্বপ্ন ভেঙে যায় টুকরো-টুকরো হয়ে, কিন্তু চড় খেয়ে এমন চ্যাপ্টা হয়ে যায়, ঘুণাক্ষরে কল্পনাও করতে পারেনি জলধি।

সমস্ত হাসপাতাল কাঁচা ঘুমে জেগে উঠলো আচমকা। দেওয়াল-গুলো ফিসফিস করে চোখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলো।

জেগে উঠলো, না, মৃদুই জাগিয়ে দিলে ঠেলা মেরেমেরে। এবড়োখেবড়ো আঁচলে প্রথমেই ছুটে এলো সে মেয়েদের কামরায়। বিস্ফারিত চোখে ও ত্বরিত নিশ্বাসে বিবৃত করলে সে ঘটনাটা। আঘাত ও লাঞ্ছনার চেয়ে বিস্ময় ও কৌতূহলেরই যেন বেশি স্বাদ পেলে অপরা।

'যেমন গিয়েছিলি মিশতে!' টিটকিরি দিয়ে উঠলো কেউ।

'তাই বলে আমাকে ও এমনি অপমান করবে? আমাকে ভেবেছে কী ও?'

'এখন অন্তত ভাবছে বেরসিক। কিন্তু করবি কী শুনি?'

'করবো কী? হষ্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে বলবো, প্রিন্সিপ্যালকে বলবো, কমিটির প্রত্যেক মেম্বার, দরকার হলে।'

'থাম, বলবি তো অত চ্যাঁচাচ্ছিস কেন?'

'মুখ বুজে মার খাবো তা হলে? কখনো না।'

মৃদু একেবারে উদ্দণ্ড! কান্না-কাকুতি নয়, মুণ্ডলোভিনী চামুণ্ডার মূর্তি।

পর দিন সকালেই সে হষ্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের বাড়িতে এসে হাজির। প্রায় নিজেকে ঘোষণা না করেই। কে একজন বাজে-মতন লোক ছিল বসে, তাকে বললে চলে যেতে।

আর-আর মেয়েরা দূরে-দূরে আছে, কেউই তারা মোকা-বিলা সাক্ষী নয়। না আসুক, মৃদু একাই একশো।

ছোট্ট দাড়িতে হাত বুলুতে-বুলুতে শুনলেন সমস্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। কিন্তু যেন খুব তৃপ্ত বা তপ্ত হতে পারলেন না। বললেন, 'ঠিক বুঝলুম না ব্যাপারটা। ঠিক কী করেছেন জলধি রায়?'

'বা, বললুমই তো। গায়ে হাত দিয়েছেন।'

'আহাহা, তাই কি যথেষ্ট হলো? বলোই না খুলে। অদালত হলে ওটুকুতে ছেড়ে দিত না।'

'আপনি তো আদালত নন। আপনি বুঝে নিন না।'

'তা, কদ্দূর বুঝবো তারই তো আন্দাজ চাচ্ছি একটা। ডিপার্টমেণ্টেল কিছু ষ্টেপ নিতে হলে ডিটেলস সব জানা দরকার। সামান্য হাত ধরাও গায়েই হাত দেয়া।' হাসিতে মুখটা কি-রকম পিছল দেখালো সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের।

'কিন্তু হাতই বা সে ধরবে কেন?' মৃদু একেবারে দপ করে উঠলো।

'নিশ্চয়ই, শত-সহস্রবার অন্যায়। কিন্তু আমি বলি কি, অপরাধেরও

দিন-রাত আছে, তর-তম আছে, যদি ওটা-বেশি মারাত্মক না হয়, তবে খুব বেশি হৈ-চৈ না ক'রে—'

'হৈ-চৈ করবো না? মুখ বুজে থাকবো? পড়বো আবার সেই মাষ্টারের কাছে?'

'না, তা কে বলছে। রায়কে না-হয় এ-স্কুল থেকে ট্রান্সফার করবার চেষ্টা করা যেতে পারে চুপিচুপি।'

'চুপিচুপি?' মৃত্ন আবার জ্বলে উঠলো: 'এমন একটা অপরাধের ক্ষালন হবে শুধু বদলিতে? তাও লোককে না জানিয়ে, বুঝতে না দিয়ে? ওর মুখে চুণকালি না মাখিয়ে?'

দাড়ি আবার একটু দুলে উঠলেন হাসিতে। বললেন, 'ওর মুখে চুণকালি মাখতে গিয়ে তু'এক ফোঁটা তোমার মুখেও লাগতে পারে। তাই, বুঝলে, এ-জাতীয় ব্যপারগুলোকে একটু বুঝেসুঝে আস্তেসুস্থেই ব্যবস্থা করতে হয়।'

'চাইনে আপনার ব্যবস্থা।' মৃত্ন তার মেরুদণ্ড টান করে দাঁড়ালো। 'জানি, শুধু পুরুষকে অভিযুক্ত করেই পুরুষের ছন্দবোধ তৃপ্তি পায় না, মেয়ে শত নিরাপরাধ হলেও তাকেই টানতে চায়। তা টানুক, লাগুক ছিটেফোঁটা, তবু আমি পাপকে প্রশ্রয় পেতে দেব না।'

'জানো, অমন বাড়াবাড়ি হৈ-চৈ করতে গিয়ে কী বিপদ হয়েছিলো একজনের?'

'হোক। শুনতে চাই না।'

'শেষকালে নিজের মান বাঁচাতে গিয়ে সেই মাষ্টারকেই বিয়ে করতে হয়েছিলো তার। যদি সত্যি নিজের মান চাও—'

'আপনার কাছে কিছু আশা করি না।' মৃত্ন অন্তর্ধান করলে।

এবার এলো সে প্রিন্সিপ্যালের বাড়ীতে। খুবই বিরক্ত, খুবই বিচলিত হলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু ভয়ংকর কিছু করবার জন্যে যেন

উন্মত্ত হয়ে উঠলেন না। বরং যেন ধামাচাপা দেবার দিকেই ঝোঁক দেখালেন। বললেন, 'রায় যদি এসে তোমার কাছে ক্ষমা চান, অনুতপ্ত হয়ে দুঃখ প্রকাশ করেন—'

অত জ্বালায়ও মৃদুর হাসি পেল। বললে, 'ক্ষমা?' ঐ অন্যায় ধুয়ে যাবে শুধু ক্ষমা চেয়েই? সামান্য একটা মুখের কথায়?'

'না, না, তুমি যদি ক্ষমায় সন্তুষ্ট না হও, তা হলে কি করে চলবে?'

'বলুন, কেউ সন্তুষ্ট হতে পারে? জুতো মেরে গরু দান হলেও চলতো, এ তো গরু মেরে জুতো দান।'

'তবে কী চাও তুমি?'

'বিচার চাই। আমি রিট্‌ন্ য়্যাপ্লিকেশন নিয়ে এসেছি আপনার যা করবার, স্কুলের সুনামের দিক থেকে, আমাদের মত অসহায় মেয়েদের সম্মানের দিক থেকে যা আপনি কর্তব্য বলে মনে করবেন, তাই করুন। নীতিবোধ, ধর্মবোধ—'

ঘেঁসাঘেঁসি-টাইপ-করা তিন পৃষ্ঠা অভিযোগ। ঘটনার চেয়ে রটনা বেশি, ব্যক্ত করে বলার চাইতে বক্তৃতা দেয়াতেই বেশি আনন্দ।

মৃদু জানতো, লাল ফিতে ধরে টানতে গেলে শুধু দীর্ঘই হবে পরিচ্ছেদ। তাই সে একে-একে কমিটির মেম্বরের সংগে দেখা করলে। ওর মাথায় যেন খুন চেপে গিয়েছে, যেমন লোকের চাপে মোকদ্দমার, এক আদালত থেকে আরেক আদালত; যেমন ঘোড়দৌড়ের, এক বাজি থেকে আরেক বাজির। মেম্বররা টেবল চাপড়ে বললে, আলবৎ, আমরা মিটিং-এর রিকুইজিশন দিচ্ছি এক্ষুনি। কিন্তু, কে জানে, কবে আর কখন সে মিটিং বসবে! কিছুই ঘটছে না তড়িঘড়ি। বায়োস্কোপে যেমন হয়, সাঁ করে সে তখন একটা চড় বসিয়ে দিতে পারেনি কেন? কী করছিলো তার হাত দুটো?

তাড়াতাড়ি কিছু ঘটাবার জন্যে খবর করলো সে স্থানীয় খবরের

কাগজগুলোকে, হিতৈষী, সমাচার আর বার্তাবহ। খবরটাকে তারা লোলুপ হাতে লুফে নিল। অনেক ফুটকি আর ড্যাসে, বিস্ময় আর জিজ্ঞাসার চিহ্নে সুরু করলো অনেক তারাবাজি। অনেক ছুঁচোবাজি।

'এত যে তড়পাচ্ছিস তুই, তোর প্রমাণ কী?' একদিন ইন্দিরা এসে কাঁধ ধরে তাকে খুব নাড়িয়ে দিলে।

'প্রমাণ?' মৃন্ময়কে যেন কে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল মাটির উপর।

'হ্যাঁ, প্রমাণ। কোথায় তোর সাক্ষী? কে দেখেছে ঐ কাণ্ডটা?'

'কেন, জলধি রায় অস্বীকার করছে?' মৃন্ময়র মনে হলো যেন তার বুকের ভিতরটা শূন্য হয়ে গেছে হঠাৎ।

'নিশ্চয়ই অস্বীকার করছে।'

'কী সাংঘাতিক!' চেয়ারের হাতলটা মুঠ করে চেপে ধরবার মতো শক্তি যেন মৃন্ময়র হাতে নেই।

'না, খুব মোলায়েম হবে তোমার ইচ্ছে মতো!' ইন্দিরা ঝাঁজিয়ে উঠলো: 'একজনের চাকরি নিয়ে টানাটানি, সমস্ত ভবিষ্যৎ নিয়ে, আর সে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করবে না, না? হাল ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে জলের তলায়? যখন সাক্ষীসাবুদ নেই তখন সে করবেই তো অস্বীকার। প্রত্যেক বুদ্ধিমানই তা করবে।'

'অসম্ভব! ভদ্রলোক হয়ে এমন ডাহা মিথ্যে কথা সে আনতে পারবে মুখে?' কেমন অসহায়ের মতো শোনালো মৃন্ময়র কথাটা।

'ভদ্রলোক হয়ে তোমাকে আক্রমণ করতে পারলো, আর সামান্য একটা মিথ্যে কথা বলতে পারবে না!' ইন্দিরা হাসলে ঠিক ছুরির আঁচড়ের মতো: 'আর সেটা যখন অমন নিরাপদ, পরিচ্ছন্ন মিথ্যা। দিব্যি সরে দাঁড়ানো আলগোছে। প্রমাণ করো তুমি। সাক্ষী তোমার দেয়াল, তোমার টর্চ, বড় জোর তোমার চ্যাঁচানি। ওথ্ ভর্সস্ ওথ্। তুমিই যে মিথ্যে বলছ না তাই বা কে বললে?'

'আমি বলবো মিথ্যে কথা ?'

'অন্তত জলধি রায় তো তাই বলছে। কেনই বা বলবে না ? ওর বিরুদ্ধে ট্রিবিউন্যাল বসাচ্ছ, ওর জীবিকা ধরে টান মারছ, আর তাই ও জো-হুকুম বলে মেনে নেবে ? কেউ নেয় ? শুনেছ কোনোখানে ?'

'আর আমিই বা ওর নামে শুধু-শুধু মিথ্যে বলতে যাবো কেন ?'

'তা তুমিই জানো। জলধি রায় তো বলে এ একরকমের ব্ল্যাকমেইল।'

'ব্ল্যাকমেইল ?'

'হ্যাঁ, তাই। ওকে তোমার বিয়ে করার ফন্দি।'

'বিয়ে করার ?' মৃদুর মনে হলো তার গলা দিয়ে যেন আর-কে কথা কইছে !

'হ্যাঁ, তাই ও সাব্যস্ত করবার জন্যে মাল-মসলা তৈরি করছে। খোঁজ নিচ্ছে তোমার বাপ-দাদাদের বিষয়ে, তোমার অতীত ইতিহাস কিছু আছে কিনা—'

'আমার তখন না চেঁচিয়ে ওঠাই উচিত ছিল।' মৃদু মরা, ঠাণ্ডা গলায় বললে, 'উচিত ছিল কিঞ্চিৎ সায় দিয়ে খপ্পরে নিয়ে আসা, তারপর পায়ের জুতো খুলে সটান মুখের ওপর—'

'আর যদি সেটা সাবস্ত্য না-ই করতে পারে, বেনিফিট অব ডাউট তার মারে কে ? অন্ধকারে কেউ যদি তোমাকে জাপটে ধরেও থাকে, ভয়ের উত্তেজনায় কাকে দেখতে কাকে দেখছ তার ঠিক কী ! হয়তো জলধি রায়কে স্বপ্ন দেখ প্রায়ই, তার মুখটাই প্রথমে মনে পড়েছে।'

'ছোটলোক ! ছোটলোক ! কদর্য ছোটলোক !' গালাগাল ছাড়া মৃদু আর কোন অস্ত্র খুঁজে পেলে না। 'মুহূর্তের ভুলে লোকে একটা অন্যায় করে ফেলতে পারে, কিন্তু জেনে-শুনে গুনে-গেঁথে মিথ্যে

কথা বলা—এ গুণ্ডামির আর চারা নেই। কিন্তু প্রমাণ হোক বা নাই হোক, পেছুবো না আমি কিছুতেই। সত্য যা তা বলবোই, তা জিতুক আর নাই জিতুক।'

কিন্তু এক ফুঁয়ে সব নিবে গেল হঠাৎ। আসর যখন খুব সরগরম, জলধি নিজের থেকেই চাকরি ছেড়ে দিলে; আর কেলেংকারি প্রায় চরমে উঠেছে মনে করে মৃদুর বাবা স্কুল থেকে মৃদুর নাম কাটিয়ে বাক্স-প্যাঁটরা বাঁধিয়ে সটান তাকে নিয়ে এলেন দেশের বাড়ীতে। জয়চণ্ডীপুরে।

বছর তিনেক কেটে গেছে তারপর। এর মাঝে একটাও দিন আসেনি যা মনে করে রাখা যায়। আজেকের দিনটাই প্রথম। আজকে মৃদুর বিয়ে।

একটা-কিছু রহস্য বা রোমাঞ্চ কিছুই মৃদু অনুভব করছে না। না বা ভয়, না বা আগ্রহ। শুধু অনুভব করছে একটা ব্যাকুল আলিংগনের ভার, কিন্তু, আশ্চর্য, সে চীৎকার করে উঠছে না। ইচ্ছে করে নিশ্চেষ্ট হয়ে আছে।

সন্ধের পরেই বিয়ের লগ্ন, মেয়েরা বসে সাজাচ্ছে মৃদুকে। শ্রাবণের বিষণ্ণ গাম্ভীর্যটি আকাশ আজ তাকে উপহার পাঠিয়েছে। কেন-কে-জানে, সাজতে মোটেই তার ইচ্ছে করছে না।

এমন সময় কে-একটি ছোট ছেলে এসে বললে, মৃদুর সঙ্গে কে দেখা করতে চায়।

'আমার সঙ্গে?'

'হ্যাঁ, তোমার নাকি মাষ্টার ছিলেন একদিন।'

ভারি অবাক করলো মৃদুকে। ছেলেবেলা পাঠশালা থেকে শুরু করে মেডিক্যাল স্কুলের কিছু দিন পর্যন্ত অনেক মাষ্টারই সে দেখেছে কিন্তু আজকের দিনটি বেছে কেউ তাকে আশীর্বাদ করতে এসেছে ভেবে

তার ভারি ভালো লাগলো। অসমাপ্ত সাজ নিয়েই চলে এলো সে বাইরের ঘরে।

'এ কি, আপনি? এখানে?' প্রায় ভূত দেখে চমকে উঠলো মৃদু। দিনের আলো নিশ্চেতন হয়ে এলেও চিনতে তিলার্ধ দেরি হয়নি তার। যদিও মাষ্টার বলাতে প্রথমটা কেমন ধাঁধা লেগে গিয়েছিলো। মাষ্টার কথাটা বড্ড বেশি নিষ্প্রাণ, দীপ্তিহীন।

'এই একটু দেখতে এলাম তোমাকে। আমি এই পাশের গ্রামেই থাকি।' বললে জলধি।

'পাশের গ্রামে?'

'হ্যাঁ, সিরিটিতে। কিছুকাল প্র্যাকটিস করছি এখানে।'

'এই অজ পাড়াগাঁয়ে?'

'কোথাও জমাতে পারলুম না। অনেক ঘুরলুম এখানে-ওখানে। শেষে ঠিক করলুম গ্রামে গিয়ে বসবো। ম্যালেরিয়ার হাত থেকে বাঁচাবো গ্রামকে।'

'তারপর নিজেই বুঝি পড়েছেন ম্যালেরিয়ায়। শুকিয়ে কালী হয়ে গেছেন দেখছি। কী ছিলেন—'

শীর্ণভাবে জলধি একটু হাসলো। বললে, 'কুইনিনই যোগাড় করতে পারছি না—'

কথাটা যেন লাগলো এসে বুকের মধ্যে। মৃদু সামান্য ব্যস্ত হয়ে বললে, 'ও কি, বসুন, বসছেন না কেন সামনের চেয়ারটায়?'

'না, বসবো না। শুনলুম তোমার বিয়ে। ভারি দেখতে ইচ্ছে করলো তোমাকে। ভাবলুম আজকের দিনে নিশ্চয়ই আর তোমার মনে কোনো গ্লানি নেই—'

'না, না, আপনি বসুন। অপনি দাঁড়াতে পাচ্ছেন না।' মৃদু এমন ভাবে এগিয়ে গেল যেন জলধির হাত ধরেই চেয়ারে বসিয়ে দেবে।

কিন্তু যেন অলক্ষে জলধিই গেল সরে। বললে, 'যদি পারি তো, কাল আসবো। একবার শুধু দেখে গেলুম তোমাকে। দেখে গেলুম কেমন আছ, আমাকে নিঃশেষে ভুলতে পেরেছ কি না—'

'ও কি, চলে যাচ্ছেন কী, কিছু মিষ্টিমুখ—'কোনো মুখেই একথা বলতে পারলে না মৃদু।

নিজের জায়গায় ফিরে এসে কিছু একটা বাহাদুরি করবার উৎসাহেই মৃদু বললে, 'এইমাত্র কে এসেছিলো জানিস, ছোড়দা? মেজদা, শুনেছিস তুই?'

বৈঠকখানায় যারা-যারা ছিল মৃদুর কাছাকাছি, তাদের মধ্যে রবি-রঘু ছিল না। রবি-রঘু মৃদুর দু'শাখার দুই খুড়তুতো ভাই। বেঁটে আর জোয়ান।

'কে? মাষ্টার ভাঁড়িয়ে এসেছিলো বুঝি? দূর থেকে তো মনে হলো দপ্তরির চেহারা!'

'জানিস, ঐ জলধি রায়।'

এক ডাকে চিনতে পেরেছে তারা। হাতের কাজ ফেলে মুহূর্তে তারা তেরিয়া হয়ে উঠলো। বললে, 'বলিস কি? ছেড়ে দিলি? মার খাওয়ালি নে? কোথায়, কদ্দুর গেছে সে হারামজাদা?'

দাঁতের মাঝখানে মৃদুর জিভটা যেন কাটা পড়লো আচমকা। বললে, 'ছি: শুভদিনে মারামারি করতে নেই।'

'শুভদিন তো ওর কী!' রঘুই বেশি তড়পাচ্ছে: 'শুভদিনে ঘরে চোর ঢুকলে তাকে মার দেব না? মণ্ডা খাওয়াবো? চল রবি, আয় তোরা, বেশিদূর এগোয়নি নিশ্চয়, দেখি একবার শালাকে—'

মৃদুর প্ররোচনায় মা-খুড়িরাই ওদেরকে নিরস্ত করলেন। বললেন, 'বিয়ের রাতে মারামারি করবি কী? লোকটার নাকি অসুখ—'

'তা ছাড়া কাল আরেকবার আসবে বলে গেছে।' মারমুখোদের মৃদু আশ্বাস দিলে।

'আসবে? আসুক। দেখা যাবে তখন। কীচক না জরাসন্ধ-বধ সেই হচ্ছে কথা।' রবি-রঘু পায়তারা কষতে লাগলো।

এর মধ্যে, রবি-রঘুর সমবয়সীদের মধ্যে, এমন কেউ কেউ আছে যারা সাপ-ব্যাং কিছুই জানে না। চোর অথচ অসুখ, মারতে হবে অথচ কোথাও যেন একটু মায়া আছে লুকিয়ে, এ কথার মানে কী! আসর সাজাতে-সাজাতে একজন জিগগেস করলে।

'মানে স্রেফ বদমাইসি। ও, তুই বুঝি জানিস না কিছু!' দু'দিক থেকে রবি-রঘু যুগপৎ গলা নামালো। এক্ষুনি-এক্ষুনি মারাটা উচিৎ ছিল কিনা তারি সমর্থনে। কিছু কথা মৃদুর কানে আসছে, কিছু কথা পূরণ করে নিচ্ছে। কতদিন থেকে শুনে-শুনে ঘটনাটা যেন দাগ কেটে আছে বুকের মধ্যে। মিলিয়ে যায়নি।

আরো একজন কে শুনছিলো উৎকর্ণ হয়ে। কাহিনীটার মোড় ঘুরতেই সে একেবারে হায়-হায় করে উঠলো। 'ছি ছি ছি, কোথায় একখানা গুগলি ছাড়বে, ছাড়ল কিনা ফুলপিচ। চালে ভুল করে ফেললো। বোড়ে না টিপে প্রথমেই ঘোড়া খেলালে।'

সবাই চমকে উঠলো, কিন্তু কেউই মৃদুর মতো নয়। চেয়ে দেখলো, পাশের বাড়ির মুখুজ্জেদের জামাই। সবাই ভাবলে চরম রসিকতা।

'হাসছিস কি বোকার মতো? রাজ্য লোপাট হয়ে যায় আর এতো একটা মেয়ের মন। ধরতে হবে কি ছাড়তে হবে না ছেড়ে ধরতে হবে—এতেই তো যুদ্ধের সমস্ত ষ্ট্র্যাটিজি। দম বন্ধ করে অন্ধকারে অমন একটা ভাল্লুকের মতো যদি না ব্যবহার করতো—'

উঠোনের দিককার জানলাটা মৃদু সজোরে বন্ধ করে দিলো।

তবু কথা কেবলি কানে আসে। কানই কথা টেনে আনে।

'যা গেছে তো গেছে।' কে যেন দাঁড়ি টেনে দিলে।

'কিন্তু কাল যদি সে আসে তাকে ছেড়ে দেয়া হবে না।' এ রবির গলা।

রঘুর গলা আরো এক পর্দা উপরে। প্রতিজ্ঞাটা আরো এক ধার প্রখর।

সেই যবনিকা-ফেলা লোকটি বললে, 'কেন, আর তার ওপরে রাগ কিসের? দিব্যি বিয়ে হয়ে যাচ্ছে!'

'দিব্যি! লেডি-ডাক্তার হবে এই ছিল মৃন্ময় স্বপ্ন আর সংকল্প। ঐ রাস্‌কেলটার জন্যে সব পণ্ড হয়ে গেল।' এই গম্ভীর গলাটা রবির।

'ফুঃ, লেডি-ডাক্তার! বিয়ের কাছে আবার ডাক্তারি। এখন দেখবি থেকে-থেকে কত লেডি-ডাক্তার এসে কত তোয়াজ করে যাবে ওকে।'

'আর বিয়েটাই বা তেমন শাসালো হতে পারলো কই? কাগজে-টাগজে লিখিয়ে শালা একটা কেলেংকারি বাধালে। শালাকে কি আর সাধে ঠুসতে চাই?' এইখানে রঘু।

'কেন, মন্দ কী হচ্ছে বিয়ে! শুনলুম নাকি সিলেটের প্রোফেসর!

'তাই বলো। আমি শুনলুম সিরিটির বুঝি!' এটা একেবারে নতুন।

'প্রোফেসর হলে কী হয়, বয়েস বেশি, প্রায় বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ। দোজবরে। সব—সব কিছুর মূল ঐ ছোটলোক, ঐ ইতর হতভাগা—'

এমন সময় একটা হুলুস্থুল উঠলো। বর এসেছে।

তারপর দিন কোথায় জলধি! রবি, রঘু ও তার সাকরেদরা আনাচে-কানাচে ঘোরাঘুরি করতে লাগলো। লাঠিতে তেল মাখানো কোনোই কাজে এলো না বোধ হয়।

'কেনই বা আসবে ?' মৃদুর প্রশ্নটা সবাই পরীক্ষা করতে লাগলো। সত্যিই তো, কেনই বা আসবে! কাল এসেছিলো, কেননা বিয়ে হয়নি তখনো, একবার দেখতে চেয়েছিলো শেষ চেষ্টা। আজ তো সাদা কাগজে দস্তখৎ পড়ে গেছে। আজ আর কখনো সে আসে।

অনেক পর, সন্ধ্যের সময় যে এলো, সে জলধি নয়, জলধির চাকর, হাজারীলাল। বললে, বাবুর কাল রাত থেকে আবার জ্বর হয়েছে, আসতে পারলেন না। এই জিনিসটা শুধু তাকে দিয়ে পাঠিয়েছেন। সঙ্গে আছেন থানার ছোটদারোগাবাবু।

না, যাকে-তাকে দেয়া চলবে না। যে-মেয়ের বিয়ে হয়েছে কাল, এ উপহার তার জন্যে, তার হাতেই পৌঁছে দিতে হবে। এই বাবুর হুকুম।

হ্যাঁ, ঠিকই তো, এই তো কাছেই সেই বিয়ে-ওলা মেয়ে। চেহারা দেখেই চিনতে পেরেছে হাজারীলাল। বাক্সটা সে নিশ্চিন্ত মনে মৃদুর হাতে সমর্পণ করলে।

মৃদু নিল হাত পেতে। কিন্তু সঙ্গে ছোট দারোগাবাবু কেন ?

খোলা থামের আলোয় খুলে ফেলল বাক্সটা। প্রকাণ্ড একটা সোনার নেকলেস। আর কী অসম্ভব ওজন!

ছোট দারোগাবাবুকে সঙ্গে দেয়া হয়েছে কেন সবাই বুঝতে পারলো ততক্ষণে। রবি-রঘুও বললে, 'পাছে চাকরটা চুরি করে পালায় সেই ভয়ে। নিজে যেমন বদ, চাকরও তেমনি একটি চোর।'

ছোট দারোগাবাবু হেঁকে জিগগেস করলেন, 'পেয়েছেন জিনিসটা ?'

রবি-রঘু বললে, 'হ্যাঁ, পেয়েছি বই কি। যা পাওয়া যায়।'

সবাই এ-হাত ও-হাত করতে লাগলো, এত বড় আর এত ভারি, কেউ বিশ্বাসই করতে পারে না। স্যাকরা কাছেই ছিল, কষে বললে, খাঁটি সোনা, ষোলো ভরি।

'পর না একবার দেখি।' কে বললে মৃদুকে।

'ও হার পরবার জন্ম নয়। বাবাঃ, একি হার না গলার বেড়ি একখানা। ও শুধু তুলে রাখবার জন্যে দিয়েছে।' বললে আরেকজন।

তুলে রাখবার জন্যে দিয়েছে। কিন্তু কোথায়?

আজ মৃদুর কালরাত্রি। স্বামীর সঙ্গে শুতে নেই।

অনেক রাতে, হ্যাঁ, এখন নিশ্চয়ই বারোটা বেজে গেছে, মৃদু সেই হার খুলে গলায় পরলো। উঃ, কী ভার, ঘাড় একেবারে হেঁট করে দেয়, আর বুকের কোনখান পর্যন্ত অপ্রতিবাদে নেমে আসে! অন্ধকারে মৃদু চোখ বন্ধ করলো। এ হারে সেই রাত্রির ভার আর এ রাত্রির জ্বর! আর অনাগত বহু রাত্রির তিক্ততা!

একেই বলে প্রেম

দোতলায় সিঁড়ির নিচে উঁচু গোড়ালির বাক-স্কিনের জুতো। শাদা, শুকনো খড়ি লাগানো হয়েছিলো বোধহয় দিন সাতেক আগে, তাড়াতাড়ি করে। এবড়ো-খেবড়ো আঁচড়ের দাগ ক'টি পর্যন্ত তার চেনা।

আনন্দে নীলাচলের বুকের মধ্যিখানটা ব্যথা ক'রে উঠলো। সন্দেহ কি, উপরে ঐ তো অদিতির গলা। তারই হাসি। সারাদিন ল্যাবোরেটরিতে খেটে অত্যন্ত শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে সে বাড়ি ফিরেছে, কিন্তু, হঠাৎ সে-মুহূর্তে নীলাচলের মনে হলো, তার খিদে নেই, আর সে সমানে সিড়ি দিয়ে উঠে যেতে পারে প্রায় আকাশেরই কাছাকাছি।

ছি ছি ছি। ছি ছি ছি। নীলাচলের নিজেকে শত মুখে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে হলো। এমন লজ্জার কথা সে ভাবতেও পারতো না কোনোদিন। সে কিনা প্রেমে পড়েছে! স্পষ্ট প্রেমে পড়েছে।

আজ থেকে পাঁচশো বছর পরে যারা আসবে, তারা আমাদেরকে বর্বর ভাববে আমরা প্রেম আর টাকা নিয়ে মাতামাতি করতুম ব'লে। একথা নীলাচল মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতো। আজকের যা সমাজের ব্যবস্থা তাতে ব্যক্তিগত ভাবে কিছু অন্তত টাকা চাই গ্রাসাচ্ছাদনের জন্মে; তাই নীলাচল এম-এস-সি পাশ করে পঁচাত্তর টাকা মাইনেতে কেমিষ্টের চাকরি নিয়েছে এক ওষুধের কারখানায়—দি ইউনিক মেডিসিন্যাল ওয়ার্কসে। সেটা সে বুঝতে পারে, এমন কি, ক্ষমা করতে পারে। কিন্তু প্রেম? কী প্রয়োজন ছিল?

আর এ দস্তুরমতো বিগলিত প্রেম। কণ্ঠস্বর শুনতে ভালো লাগে, হাসি শুনলে বুকের রক্ত উপচে পড়ে। নিরালায় কাছে এসে বসলেও ছুঁতে ইচ্ছে করে না, মন দেহের কিনারে-কিনারে ঘুরলেও মনে পড়ে না কোথায় আছে তার দেহ। চোখের উপরে চোখ আর হৃদয়ের উপর হৃদয় রেখে পৃথিবীর জনতাকে উপেক্ষা করতে ইচ্ছে হয়। সব নিয়ে নিতে পারি জেনেও শুধু নিজেকে দিয়ে দেবারই সাধ জাগে। কিছু

একটা করি, কিছু একটা হই, এও যেমন বলায় ; কিছুই যে করিনা, কিছুই যে হই না, এও তেমনি মেনে নেয়, মার্জনা করে।

তেমন প্রেম। তেমনি সেকেলে, চ্যাটচেটে! জিনিসটা তো বটেই প্রণালীটাও। কত যুগের গাদ-ধরা। লজ্জায়, অনুশোচনায় নীলাচল নিজেরই কাছে ছোট হয়ে গেল। অদিতির মুখখানা সে দেখবে, তার মুখের উপর চলকে পড়বে তার ক্ষণিক হাসির রোদ, গোপনে কয়েকটি ঝাপসা কথা, হয়তো অর্থ তার কিছু আছে বা নেই,—তারি জন্যে সে এখন সিঁড়ি ভেঙে উপরে যাবে নিঃশব্দে, ভাবতেই তার পা দুটো কাঠ হয়ে রইলো। তারো হাড়ে বাসা বাঁধবে এই ঘুণ, এ নীলাচল হতে দেবে না।

আজকের যা সমাজের ব্যবস্থা তাতে জীবিকার জন্যে চাকরি জুটলেও জীবনের জন্যে প্রেম নেই। থাক, একে আর প্রেম বোলো না। আশে-পাশে, হাটে ঘাটে, খেলায়-ধুলায় আপিসে-কাছারিতে কোথাও একটা মেয়ের সন্ধান নেই ; দৈবাৎ যদি একটা জুটে গেল, আর যেটা প্রথম জুটলো, (দু'দিন আলাপ, একসঙ্গে একটু চা বা সিনেমা বা এর-ওর বাড়িতে এক-আধবার যাওয়া-আসা।) অমনিই কিনা তার সঙ্গে সেটা প্রাণান্তকর প্রেম হয়ে দাঁড়ালো। এ প্রেম নয়, কৌতূহল। যৌন ইচ্ছার অব্যক্তরাগ। অনেক যাদের বিশ্রাম আর অল্প যাদের কর্ম তাদেরই একটা সুলভ মনোবিলাস মাত্র।

এ ধরণের বক্তৃতা নীলাচল অনেক দিয়েছে। প্রেম হচ্ছে পোকায়-খাওয়া নড়বড়ে দাঁত, শিকড় ধ'রে টেনে তুলে ফেলা উচিত, যদি চাও স্বাস্থ্য আর শক্তি। এ-কথা শুধু সে বলেনি, বিশ্বাস করেছে। এ বৈজ্ঞানিক যুগে অমন একটা অবৈজ্ঞানিক মনোভাব সে বরদাস্ত করতে পারতো না। তা ছাড়া, আজকের এই ইস্পাতের পৃথিবীতে, যেখানে এত মৃত্যু এত বীরত্ব, সেখানে কেউ ভঙ্গিটাকে নরম করে এনে

ভক্তিতে প্রেমের নৈবেদ্য সাজাতে বসবে, চোখে কাজল লাগিয়ে সবুজ. সম্পূর্ণ ও সমতল দেখবে এই দগ্ধ, রিক্ত, বক্র পৃথিবীকে, এ তার কাছে একটা পাপ ব'লে মনে হতো। কিন্তু এমনি ভাগ্যের ফের, সেই কিনা জালে আটকা পড়েছে। যেন তক্ষুনি-তক্ষুণি ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে যায় না, এমনি জাল। ঠিক সেই নম্রতা, সেই দৌর্বল্য, সেই শীতল আলস্য, এত মৃত্যু এত বীরত্ব সত্ত্বেও। পৃথিবীকে তবু যেন কেন ভালো লাগে; ভরসা হয়, আকাশের নীল চুরি যাবে না কোনোদিন। তার উপর, আরো এমন মজা, সেও বিনানির্বাচনে বিনাপ্রতীক্ষায় সেই প্রথমাগতাকেই ভালোবেসেছে। সেই দু'দিনের আলাপ, সেই একসঙ্গে একটু চা আর সিনেমা (ছি ছি ছি, সে ওসব রোথো জোলো সিনেমা দেখেছিলো), সেই পরস্পরের বাড়িতে যাওয়া-আসা, পরিচয়ের পরিসর বাড়ানো—আর তারো বেলায়, হায়, তাকেই সে অমনি বলতে চাইছে, প্রেম! রাগে শরীর তার রি-রি করে উঠলো। ধিক, ধিক, শত ধিক তাকে।

কেন, কী হয়েছে তার? কিছুই হয়নি। শুকনো খটখটে একটু বন্ধুত্ব, ধারালো চূড়ায় না উঠে আশে-পাশে বিস্তীর্ণ বিচরণ। ঘেঁসে পাশে এসে দাঁড়ালেই পিপাসা পেতে হবে, হাতের নিষ্পেষকে নিয়ে যেতে হবে বুকের আশ্লেষে, এ কেমন ব্যবহার? বিকৃত, ব্যাধিগ্রস্তের মতো? সম্ভ্রম আর শালীনতা যাকে বলে, এখনো তার শেখা হয়নি, যাকে বলে নিঃস্বার্থ আসক্তি, বীর্যবান ঔদাসীন্য। সে এখনো সেই দুপক্ষ অশক্তের দলেই থেকে গেছে। প্রায় কান্না আর কবিতার কাছাকাছি।

না, ঘটতে দেবে না সে এই আত্মঘাত, এই অধঃপতন।

তবু, খাবার সন্ধানে রান্নাঘরে না গিয়ে নীলাচল উপরেই উঠে গেল। পা টিপে টিপে নিজের অজানতে।

অনেকক্ষণ পর, শুধু সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময়ই দু'জনে একটু কথা বলতে পারলো জনান্তিকে। দ্রুত আর সংক্ষিপ্ত।

'তুমি অনেকদিন যাওনি আমাদের বাড়ি। একদিন যেয়ো।'

'হ্যাঁ, যাবো।'

'খুব তাড়াতাড়ি। বাবাকে বলতে হবে।'

'হ্যাঁ।'

'বেশি দেরি কোরো না কিন্তু।'

'না।'

সিঁড়ির ধাপ আর নেই। নীলাচলেরো যেন হাঁফ ছাড়লো।

মোটর এসেছে অদিতিকে নিতে। মোটরে চলার বেগ সঞ্চার হতেই ঢাকা কোণ থেকে অদিতি সামনে একটু ঝুঁকে পড়ে মুখ বাড়িয়ে হাসলো। তার উত্তরে নীলাচলও হেসেছিলো কিনা, না, মুখ নিস্পৃহ কঠিন করে রেখেছিলো, মনে করতে পারলো না।

বাবাকে বলতে হবে! পাঁচশো নয়, একশো বছর পরেই লোকেরা হাসাহাসি করবে যে আগেকার লোকেরা বিয়ে করবার আগে বাপেদের মত নিত; বাপেরা মত না দিলে সে-বিয়ে হতে পারতোনা, হলেও সংসারে অনেক অশান্তি, অনেক আলোড়ন উপস্থিত হতো। যাতে তাল যেত কেটে, ক্রমে-ক্রমে স্নায়ু যেত নিস্তেজ হয়ে।

মুক্ত ক্লেদের সংস্পর্শে এলে মন যেমন ঘেন্নায় বিষিয়ে ওঠে, তেমনি লাগলো এখন নীলাচলের। তাকেও কিনা মনোমোহনবাবুর কাছে গিয়ে আর্জি পেশ করতে হবে, আপনার মেয়ে অদিতিকে আমি বিয়ে করতে চাই। আর, মনোমোহনবাবু যখন তাকে প্রত্যাখ্যান করবেন (প্রত্যাখ্যান যে করবেন তা তো তার জানা-ই—তার মাইনে মোটে পঁচাত্তর), তখন সেও পূর্ববর্তীদের মতো বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদবে, কামাবিষ্ট কবিতা লিখবে, বা পটাসিয়াম সায়ানাইড খাবে, বা নিতান্ত

গুণ্ডার মতো অদিতিকে নিয়ে পালিয়ে যাবে, এ-ষ্টেশন থেকে ও-ষ্টেশন, ওয়েটিংরুম আর ধর্মশালায় রাত কাটিয়ে, অনিয়ম করে, যা-তা খেয়ে শরীর খারাপ করে ফিরে আসবে কোলকাতায়; ঘিঞ্জি পাড়ায় ঘুপসি বাড়ি ভাড়া নেবে, প্রতি পক্ষের সঙ্গে দিবারাত্র ল'ড়ে ল'ড়ে প্রেমের পালিশ যাবে ধুয়ে, ভরবেগ যাবে স্তিমিত হয়ে, দেখা দেবে সব উদ্ভট রোগ, যা এতদিন তাদের ছিল না পারতো না হ'তে। ঈশ্বর সে মানে না, যদি থাকেন, তবে তিনি তাকে রক্ষা করুন।

বিয়ে করতে চায় সে অদিতিকে? চায়? কী এমন মেয়ে একটা অদিতি! তেমন লম্বা নয় যার দৈর্ঘ্যটাই হবে একটা অকম্প ঔজ্জ্বল্য। বরং বেঁটের দিকেই বলা উচিত পক্ষপাত না করে। খুব ঝরঝরে তরতরে নয়; বরং একটু অলসগমনা। গোলালো শরীর, ঝোঁক মজ্জার দিকে নয়, মেদের দিকে। আর মুখ? আশ্চর্য, গোটা মুখটা নীলাচল কিছুতেই মনে করতে পারে না। শুধু তার হাসিটা মনে পড়ে। মস্ত-বড়ো হাসি। অল্প সে কিছুতেই হাসতে পারে না। শব্দ না করেও যখন সে হাসবে তখনো সে অনেকখানিই হাসবে। মাড়ি-শুদ্ধু প্রায় সব ক'টি দাঁত আসবে তার বেরিয়ে। শুনতে ভালো লাগে না, দেখতে অপূর্ব লাগে। দাঁতগুলি আঁট, ঝকঝকে, মাড়িগুলি নিখুঁত, কোথাও-কোথাও দাঁতের ফাঁক দিয়ে তা সূক্ষ্মরেখায় নেমে এসেছে। শুধু মাড়ির জন্যে মরবে এমন আনাড়ীও কেউ আছে নাকি সংসারে? নইলে আর তার আছে কী? যদিও সমস্ত মুখটা কিছুতেই একসঙ্গে তার মনে আসবে না, তবু আলাদা-আলাদা করে যতটা সম্ভব সে খতিয়ে দেখেছে নাক-মুখ। কেননা জিজ্ঞাসাটা তার অনেক দিনের, কেন, কিসের আকর্ষণে মন তার ঘুরঘুর করে? চোখ? চোখ দুটো তো ভাসা-ভাসা, প্রায় বোকা-বোকা বলা যেতে পারে, ভুরু তো সুরুতেই শেষ। নাকটা তো নিরবশেষ বোঁচা। মোটা

আর ফাটা ঠোঁট দুটোতে, এখন, শীতে, সব সময়েই তো গ্লিসারিন মাখা। তবে কি ভালো লেগেছিলো তার যৌবন? মিথ্যে কথা। নীলাচল ঈশ্বর মানে না। নইলে অন্তর্যামীকে সাক্ষী মানতো। যৌবন? যৌবন তো যে কোনো যুবতী মেয়ের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য।

তা ছাড়া, অদিতি বড়লোকের মেয়ে, পাখার তলায় ইজিচেয়ারে শুয়ে ভিজে চুল শুকোতে-শুকোতে যে খবরের কাগজ পড়ে। তার সঙ্গে কত তফাৎ। সে হচ্ছে হাইমেন্থাস ফুল, লাল পাউডার-পাফের মতো; যে-ফুল পাতা বেরুবার আগেই জন্ম নেয় গাছে। ক্যাপিট্যালিষ্ট সমাজ যে-অর্থে স্ত্রীকে দেখেছে, ব্যক্তিগত বিলাস ও মর্যাদার নিদর্শন, সে-অর্থ আর এখন মেনে নেয়া যাচ্ছে না। স্ত্রী হবে সঙ্গিনী, সহকর্মিনী। নীলাচল যদি কামার-শালায় কাজ করতো, তবে নেহাইর উপর অদিতি রাখবে এনে গরম লোহা আর সে তাতে হাতুড়ির ঘা দেবে। যদি কাজ করতো ক্ষেতে, সে হাল দেবে আর অদিতি ঢেলা ভাঙবে মুগুর দিয়ে। যদি সে কাজ করে ল্যাবোরেটরিতে, তবে অদিতি দাঁড়াবে তার পাশে, ভাগ দেবে তার রসায়নে, তার গবেষণায়। কিন্তু সে-যোগ্যতা অদিতির কোথায়? নীলাচল খাটবে কারখানায় আর অদিতি বাড়িতে বসে চোখ গোল করে উপন্যাস পড়বে—এ অসম্ভব। সে হয়ে থাকবে একটি বিলাসী আসবাব, অচল, আবদ্ধ, স্পর্শ-অসহ, এ কখনো সহ্য করা যাবে না।

তবু একদিন রাত্রে নীলাচল গেল অদিতিদের বাড়ি, আর আশ্চর্য, মনোমোহনবাবুর সঙ্গেই দেখা করতে।

রাত করেই ফেরেন মনোমোহনবাবু। একটা বিদেশী বাতের-ওষুধের তিনি সোল এজেন্ট, গোটা ভারতবর্ষে। কী আয় চট করে ভেবে নেয়া যায় না। আর, কে না জানে, বাতের কোনো শেষ ওষুধ নেই, আর বাত যাদের হয় তাদের ওষুধও কিনতে হয় শেষ পর্যন্ত।

তাই যেটা যত বেশি সাময়িক কাজ দেয় সেটার তত বেশি অসামান্যতা।

অনেক ইয়ং ম্যানই আসে বাড়িতে, তেমনি কৌতুহলহীনভাবেই নীলাচলকে চিনতেন মনোমোহনবাবু। একটু নিরালা হতেই ডাক দিলেন নীলাচলকে।

নীলাচল অমন দুর্বল, বিনম্র ভঙ্গিতে না ঢুকলেই পারতো। সে তো জানে এর ফলাফল। যদি সে একটা মজা দেখতেই এসে থাকে, তবে তার ভঙ্গিটাকে আরো বিশেষ্ট আরো নিরাসক্ত করা উচিত ছিল।

মনোমোহনবাবু ভেবেছিলেন কোনো এজেন্সি চায় হয়তো। কিন্তু একেবারে মেয়ে চেয়ে বসবে কল্পনাও করতে পারেন নি। গোঁফ ফুলিয়ে জিগগেস করলেন, 'অদিতির মত আছে?'

'আছে।' যেন সেটা কত অসঙ্গত এমনি শোনালো নীলাচলের কথাটা।

'আছে? তবে আমার কাছে এসেছ কেন?' মনোমোহনবাবু মোটা একটা ফাইল খুলে চিঠি খুঁজতে লাগলেন।

তবু নীলাচল বসে রইলো চেয়ারে। অনেকক্ষণ পর ঢোঁক গিলে ঠোঁট চেটে বললে, 'আপনার মত চাই।'

'আমার মত?' মনোমোহনবাবু নাকের মধ্য দিয়ে ছোট হুঙ্কার দিলেন: 'কী কাজ করো?'

নীলাচল বললে।

'কোথায়?'

নাম করলে নীলাচল।

মনোমোহনবাবুর হুঙ্কার এবার ঝঙ্কারের মতো শোনালো: 'ঐ যেটা কেষ্টা দালালের ছেলে বিষ্টু দালাল খুলেছে? ওখানে তো

সাবান-স্নো তৈরি হয় জানতুম, ওষুধ কোথায়? চেহারাখানা কাকের মতো, মেয়ের নাম রেখেছেন ময়না!'

'না, আছে একটা লিভার টনিক—'

'চিরেতার জল! মাইনে পাও কত?'

নীলাচলের বুকের মধ্যিখানটা যেন কে মুঠি চেপে ধরলো। যেন অনেকদিনের পড়া উপন্যাস সে আবার পড়ছে, বিশ্রী, বিরক্তিকর। সমস্ত তার জানা, পরের পর পরিণাম।

'পঁচাত্তর টাকা।' গলাটা একটু কেঁপে গেল বোধ হয় নীলাচলের।

'এতই দেয়? বল কী হে? কেষ্টার ছেলে বিষ্টার এতই দরাজ হাত?'

'আরো বাড়াবে বলেছেন।'

'কত?'

'একশো।'

'মাস-মাস অদিতি কত হাত-খরচ নেয় জানো?'

নীলাচল মনোমোহনবাবুর গোঁফের একটা পক্ক গুচ্ছের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো।

'একশো এক টাকা।' একশো ও এক দুটোই একসঙ্গে বোঝাবার জন্য মনোমোহনবাবু তাঁর খর্ব তর্জনীটা উৎক্ষিপ্ত করে ধরলেন। পরে হঠাৎ সেই তর্জনী ঘরের ও বাইরের ফটকের দিকে ধাবিত হলো। দুটি মাত্র শব্দে বা প্রতিশব্দে তিনি বিদীর্ণ হলেন: 'বেরিয়ে যাও। গেট আউট।' পরে যেটা বললেন সেটা নিম্নস্বরে: 'হাতখরচ ওর আরো বাড়িয়ে দিতে হবে দেখছি, নইলে নজর উঁচু হবে না।'

সম্পূর্ণ অবিচলিতের মতোই নীলাচল বাইরে বেরিয়ে এলো। বাঁচলো যেন হাঁপ ছেড়ে। ভেঙে পড়বার বা রাগারাগি করবার

কোনোই কারণ দেখলো না। এমন কি, দেখবার জন্যে পিছন ফিরেও তাকালো না একটু, জানলায় দাঁড়িয়ে আগের মতোই অদিতি তার যাওয়া দেখছে কি দেখছে না। যা সে ছাড়ে এমনি ক'রেই ছাড়ে। বরং তাড়াতাড়ি পা চালালো পাছে শেষ ট্রামটাও না বেরিয়ে যায়। খুব হালকা, ঝরঝরে লাগছে শরীরটা। যেন একটা দায়-সারা কাজ সেরে এসেছে কোনোরকমে। কিম্বা তারো চেয়ে বেশি। যেন কোন পাপ কাজ করে বেরিয়ে আসছে অন্ধকারের থেকে; জনতার মাঝে এসে, গতির ঘূর্ণাবর্তের মাঝে এসে, মুছে ফেলছে সেই অস্বাস্থ্যকর স্মৃতি, মনকে মার্জিত করে নিচ্ছে অনুতাপের আগুনে।

গতি আর জনতা। কোথায় তখন অদিতি, কোথায় বা নীলাচল। কে কোথায় ছিটকে বেরিয়ে পড়েছে, কোথাও কোনো ঠিকানা নেই। কত এমন যায় আর আসে সময়ের স্রোতস্বিনীতে, কত খড়কুটো, কত আবর্জনা। কে কার হিসেব রাখে। তেমনি ভেসে যেতে দিল সে অদিতিকে। আর সে, নীলাচল, ভাসলো না, ডুবলো একেবারে।

ডুবলো মানে কাজে ডুবলো, ল্যাবোরেটরির -কাজে। সকাল দশটায় যায় আর রাতে যে কখন ফেরে তার ঠিক নেই, কোনো-কোনো রাতে ফেরেই না একেবারে। কখন খাওয়া, কখন ঘুমোনো, সব এলোমেলো অমিছিল হয়ে গেছে, চেহারা যাচ্ছে শুকিয়ে, শীতের হাওয়ায় নিষ্পত্র শাখার মতো। যেন এক ভূত ভর করেছে তার কাঁধে, কাজের ভূত। দিবারাত্র কাজ, প্রায় রণোন্মাদের মতো।

ব্যাখ্যাকারের অভাব ছিল না, ভিতরের খবর যারা জানে, বললে, বড্ড চোটটা পেয়েছে প্রেমে হোঁচট খেয়ে, তাই কাজ দিয়ে ভোলাচ্ছে নিজেকে। নীলাচল হাসে, বলে, পুরো একটা বছর কেটে গেল তারপর, তবু, তুচ্ছ একটা মেয়েকে এই এক বছরেও ভুলতে পারা

যাবে না? যদি ওটাকে প্রেমই বলো, তবে বলতে পারি, এক প্রেম এক ঘুমেরই সমান। আর এ তো এক বছরের ঘুম!

তারপর আরো এক বছর কাটলো। কাজ উঠলো আরো তেজালো হয়ে। বলো, এখনো সে ভুলতে চাচ্ছে অদিতিকে। কোথায় কোন মাটির পরলে মাটি, কোন পাথরের ফাটলে পাথর হয়ে গেছে কে জানে। এক ছত্র কেউ চিঠি লেখেনি কাউকে, দৈবাৎ মুখোমুখি দেখা হয়নি কোনোদিন। খালি একদিন, অনেক দিন আগে, এক শীতের মধ্যরাত্রে বায়স্কোপ ভাঙবার পর তাকে দেখেছিলো যেন কার খোলা মোটরে, ঘোলাটে গ্যাসের নিচে। গায়ে একটা পুরু পশমের স্কার্ফ ছিলো, একবার অতি-অবহেলায় স্কার্ফটা তুলে নিয়েছিলো গা থেকে, চকিতে চোখে পড়েছিলো তার গায়ে, ঠিক চামড়ার উপরেই, একপাত পাতলা সিল্কের ব্লাউজ, যার গলাটা বুকের শেষে আর হাতটা কাঁধের মধ্যিখানে। গণ্ডাস্থিচূড়ায় গোলাপের দু'টি কুঁড়ি রয়েছে ফুটে, চোখে বিলোল করে সুর্মা টানা। পাশে ওভারকোট-গায়ে-জড়ানো সুট-পরা আধাবয়সী ভদ্রলোক, মুখে পাইপ। এ দৃশ্য দেখে, অত রাতেও, যখন নীলাচল ফের ল্যাবোরেটরিতে গিয়েই ঢুকলো, বসলো মাইক্রোস্কোপ নিয়ে, তখন নিশ্চয়ই কেউ মেনে নিতে পারে না যে তাঁর কাজের সঙ্গে অদিতির কোনো সম্পর্ক আছে। বরং চোরা পথে কোনো নাইট ক্লাবে ঢুকে হৈ-হল্লা করলে ভাবা যেতে পারতো যে অদিতি তার মনে এনেছে বিগত দিনের মৃত [illegible]র আন্দোলন।

সে অবস্থা ফেরাচ্ছে একথাও মেনে নেয়া যায় না। 'কেষ্টার ছেলে বিষ্টা'—মনোমোহনবাবু সেদিন ঠিকই বলেছিলেন। ব্যবসা ফ্যালাও করে ফেলছেন ক্রমে-ক্রমে, নীলাচলেরই কর্মগুণে, অথচ নীলাচলের লাভ বাড়ছে না লাফিয়ে-লাফিয়ে। পিঁপড়ে টিপে গুড় বার করার

মতো যেটুকু মাইনে বলে নিচ্ছে বাড়িয়ে তাতে নীলাচল আবার ল্যাবোরেটরির জন্যেই যন্ত্রপাতি কিনছে, মালমশলা কিনছে। এমনি কিনতে চাও, বলবেন, পাগল; নিজের পয়সায় কিনতে চাও, মুখে না বললেও মনে-মনে অন্তত ভাববেন, পাগল ছাড়া আর কী! পায়ের সেলিম-সু এখন স্যাণ্ডেলের মতোই ব্যবহার করছে, গোড়ালির গোড়া থেকে ছিটকে উঠছে প্রতি পায়ে। জামা আর ধুতির ময়লাতে সাম্য থাকছে না। বোতাম তার ঘর ছেড়ে পরের ঘরে গিয়ে ঢুকছে। চুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে মাথার খানিকটায় চকচকে টাক করে ফেলেছে। ক্রমশই পাগলামির দিকে এগিয়ে চলেছে নীলাচল।

তারপর যখন সে ঠিক করলে বিয়ে করবে তখন সে বদ্ধ পাগল। বিয়ে করবে, যাকে-তাকে বিয়ে করবে, ছোট হোক, বড়ো হোক, রোগাপটকা হোক, ধুম্বী হোক, সুন্দর হোক, কেলেকিষ্কিন্দে হোক কিছুতেই তার অরাজি নেই, একটা তার হলেই হলো, যে অনুগত বাধ্য হবে আর ওষুধ খাবে চোখ বুজে।

'কোনো অসুখ আছে?' মেয়ে দেখতে গিয়ে নীলাচল জিগগেস করে।

বুক ফুলিয়ে অভিভাবকরা সমস্বরে উত্তর দেয়: 'না।'

মুখ গম্ভীর করে নীলাচল খারিজ করে দেয় তক্ষুনি।

'অসুখ আছে কোনো?' আবার সেই প্রশ্ন।

সপ্রতিভ হবার চেষ্টায় মেয়েটি বলে, 'একমাত্র কন্স্টিপেশন আছে।'

নীলাচলের দু' চোখ জলজ্বল করে ওঠে: 'বা, ভালোই। তবে, পুন্নিমে-অমাবস্যেয় ফোলে আপনার হাত-পা? লুকোবেন না, কিছু ভয় নেই, অতশত না হলেও গিঁটে কোথাও মিঠে-মিঠে ব্যথা করে, কব্জিতে বা মালাইচাকিতে? হাড়ে না হোক, রগে টান ধরে না কোথাও? ঘাড়ে, কোমরে—'

কোমরে দড়ি না পড়লেও ঘাড়ে প্রায় ধাক্কা খাবার জোগাড়।

মেয়েদের দ্বারা হবে না, কোনো কিছুই হয়নি এ পর্যন্ত। নীলাচ ভদ্রলোক রাখবে? যে শোনে সেই তাকে পাগলা গারদে পাঠাবার প্রথম-ট্রেনের খবর দেয়। পাগলা গারদ? খোরপোষ দিচ্ছি, তদুপরি উপরি দিচ্ছি মাইনে ব'লে, এর চেয়ে সুস্থমস্তিষ্কতা আর কী হতে পারে? হ্যাঁ, ক্লিনিক খুলছি একটা, তাতে ক'টা নির্দায় রুগী চাই, হ্যাঁ, বেতো, বেতো রুগী—গ্রন্থিবাত, সন্ধিবাত, বস্তাবন্দী বাত। আছে কেউ?

সবাই বললে, 'ঘোড়া দেখ।'

ইত্যাকার যখন অবস্থা, তখন যুদ্ধ বাধলো ও জাহাজ না এলেও চোরাবাজারে মজুত মাল বেচে মনোমোহনবাবু বেলুনের মতো ফাঁপতে লাগলেন।

আর ঠিক এই সময় ওষুধ বেরুলো নীলাচলের। আর তার উদ্ভাবন বিনা দ্বন্দ্বে সরকারী ও বেসরকারী সমস্ত হাসপাতালের সুখ্যাতি ও স্বীকৃতি পেল। ছোট একটি শাদা বড়ি, বিদেশী ওষুধের প্রতিকল্প, এবং অনেকাংশে তার চেয়ে বেশি হিতসাধক। আর সব চেয়ে যা আকর্ষণের, দাম নিদারুণ কম। দেখতে-দেখতে ওলোটপালোট খেয়ে গেল, প্রায় ভোজবাজির মতো। বেতো রুগীরা পাশ ফিরতে লাগলো বিছানায়, হাঁটু মুড়ে বসতে লাগলো আসনপিঁড়ি হয়ে, নিশ্চিন্ত হয়ে হাঁচি-কাশি দেবার সাহস অর্জন করলে। নীলাচলের শুধু মাইনেই বাড়লো না, কেষ্টর ছেলে বিষ্টু কারখানায় তাকে একটা ভদ্র মুনফা দিলে, এমনকি প্রত্যেকটা ওষুধের খাপে।

ঠিক পড়া উপন্যাসের মতো লাগছে, একদিন কারখানায় স্বয়ং মনোমোহনবাবু এসে হাজির। ফুটো বেলুনের মতোই চুপসোনো।

'তখন বুঝতে পারিনি, বাবা, একেই বলে প্রেম।' মনোমোহনবাবু নীলাচলের কাঁধে সাদর চপেটাঘাত করলেন।

এখনো প্রেম! নীলাচল হাঁ হয়ে রইলো। সমস্ত বিদেশী ওষুধ বাজারে কোণঠাসা করে দিল তার যা উদ্ভাবন তার প্রশংসা না করে প্রেমের জয়গান! তাও মনোমোহনবাবুর মুখে।

'হ্যাঁ, তুমি নিজেই জানো না, কে সে অদৃশ্য শক্তি তোমাকে দিয়ে, তোমা-সত্ত্বেও, দৈত্যের মতো কাজ করিয়েছে। তোমাকে খেতে দেয়নি, ঘুমুতে দেয়নি, উদ্‌ভ্রান্ত করে রেখেছে তোমাকে তোমার জয়ের স্বপ্নে। কিসের জয়? প্রেমের। নইলে, ভেবে দেখ, এর পেছনে তোমার লোভ ছিল না যে বড়লোক হতে হবে, হিংসা ছিল না যে আমাকে পথে বসাবে, স্রেফ পরের ভালো করবে এমন পাগলামো ছিল না, ছিল প্রেম। যে ভালোবাসে সে বুঝতেই পারে না যে সে ভালোবাসে। সামান্য, সাধারণ যে নিশ্বাস ফেলে, সেখানেও তার ভালোবাসা—'

স্বচ্ছন্দে বক্তৃতা আরো দীর্ঘ করতেন মনোমোহনবাবু, কেননা, বোঝাই যাচ্ছে, অদিতির এখনো বিয়ে হয়নি। আর নীলাচলের যা পড়তা পড়েছে, উঠে এসেছে সে এখন সৎপাত্রের পর্যায়ে। পূর্বস্মৃতি চুলকিয়ে যদি এখন একটু বাড়ানো যায় আগ্রহ।

'গেট আউট।' খুব একটা নাটকীয় ভঙ্গি করে বলতে বড়ো সাধ হচ্ছিলো নীলাচলের, কিন্তু অনেক কামনার মতো এটাও সে দমন করলো।

সেই পুরোনো পড়া উপন্যাসে এখানটায় বোধহয় তাই ছিল। বিতাড়িত প্রেমিকের যখন অবস্থা ফিরলো তখন সে তার প্রাক্তন প্রেয়সীকে দেখিয়েছে কলা আর তার বাপকে কোঁৎকা। কিন্তু নীলাচল তার কিছুই করবে না। সে মেনে নেবে প্রেমের অনুশাসন।

'আমি শিগগিরই যাবো একদিন আপনাদের বাড়ি।'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়। যদিও সে বাড়ি আর নেই, বেচে দিয়েছি। উঠে এসেছি এখন এক ঘুপচি ভাড়াটে বাড়িতে। তোমাকে বলতে আর সংকোচ কী! আমার এক মেয়ে, তোমরাই আমার সব। কালকেই যেয়ো, কেমন? দেখো, ভুলো না।'

ভোলা সম্ভব হবে না।

কিন্তু তার আগেই, আজকেই, সন্ধ্যাবেলা, দোতলার সিড়ির নিচে কার একজোড়া ধুলোমাখা ঘসা স্যাণ্ডেল। নীলাচলেরো এখন নতুন বাসা, নির্জন ঘরদোর। মেয়েলি স্যাণ্ডেল পায়ে কে আসবে এ অসময়ে? বুকের ভিতরটা ঝলি-বুলি করে উঠছিলো, কিন্তু বাপের কাছ থেকে পাকাপাকি খবর শোনবার আগেই এমন দুঃসাহস দেখাবে বিশ্বাস হচ্ছিলো না।

মুখ দেখা না গেলেও শরীরের কিছুটা অংশ দেখেই নীলাচল চিনলো অদিতিকে। নীলাচলের এখন আলাদা ঘর, সেই ঘরে বসেছে সে একটা উঁচা দেখে চেয়ারে, দাড়ি কামাবার টেবিলের কাছে। কত বছর পরে দেখা। পরনে শাদা সমতল একটি শাড়ি, গায়ে নিঃস্ব ব্লাউজ। যেন আগের চেয়ে খানিকটা রোগা হয়েছে, অনেকটা ক্লান্ত। তার দিকে এমন ভাবে তাকালো, যেন খুব মান্য, পূজ্য দেবতার দিকে, ভয়ে-ভয়ে, বিহ্বল ভক্তিতে।

'কোথেকে আসছ?' দীর্ঘ দিন পর কথার আরম্ভটা কেমন বেখাপ্পা শোনায়।

'বাড়ি থেকে!'

'তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

'হ্যাঁ, তাই সাহস করে এলুম। তিনি বললেন, এখনো নাকি করুণা করতে পারো।' বলে অদিতি দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেললো। ফুলে-ফুলে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে। প্রার্থনার কান্না, কৃতজ্ঞতার কান্না। মুখে

অনেক রঙ মাখা ও রঙ তোলার লাঞ্ছনার থেকে মুক্তির কান্না। ভিক্ষা পেতে যেমন কাঁদে, ভিক্ষা পেলে যেমন কাঁদে।

নীলাচলের কেমন ভিজে-ভিজে লাগলো নিজেকে। ঘরবাড়ি কেমন স্যাঁতসেঁতে, জিনিসপত্র কেমন ছাতলাধরা মনে হলো। অদিতিকে কাঁদতে দিয়ে সে আস্তে-আস্তে নেমে গেল নিচে।

আর যাই হোক, করুণা তো আর প্রেম নয়।